ঐতিহাসিক দলিল

সিরু বাঙালি

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধকে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সিরু বাঙালি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। চট্টগ্রামে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ ইতিহাসের একটি গর্বিত অধ্যায়। এই অধ্যায়ে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁরা জাতির সূর্য সন্তান এবং বাঙালি জাতিসত্তার শৌর্য-বীর্যের প্রতীক। কিন্তু আমাদের এই গর্বিত ইতিহাসকে তথ্য বিকৃতিতে কেউ কেউ কলঙ্কিত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন এবং নিজেকে জাহির করার জন্য সত্যকে ঢেকে দিয়েছেন ও ছলে-বলে-কৌশলে মিথ্যেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এরা তো ইতিহাসের খলনায়ক।
সিরু বাঙালি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনাধর্মী এই গ্রন্থে সত্যমিথ্যেকে সনাক্ত করেছেন। সর্বোপরি প্রামাণ্য ও দালিলিক উপস্থাপনায় তিনি সত্য প্রতিষ্ঠায় মিথ্যের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন।
এই ধরনের একটি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগকে সময়ের দাবি বলে মনে করি। দুর্বিনীত দুঃসময় মোচনে সিরু বাঙালির এই গ্রন্থটিতে ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য-উপাত্ত সংযোজিত হয়েছে, যা থেকে নতুন প্রজন্ম ইতিহাস বিকৃতির চোরাগলি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই গ্রন্থটি সত্যের উজ্জ্বল উদ্ধার হিসেবে ইতিহাসের খলনায়কদের নির্বাসন দেবে।

জামাল উদ্দিন

লেখকের ভূমিকা

মেজর জিয়া স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন নি। একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ সুকৌশলে মেজর জিয়াকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল। পাকিস্তান ভেবেছিল, মুক্তিযুদ্ধে তাদের হার হলে, পরবর্তী সময়ে সে হারের প্রতিশোধ নিতে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে তাদের একজন নিজস্ব এজেন্ট থাকা দরকার। এজেন্টটি হতে হবে বাঙালি এবং পাকিস্তানের প্রতি নিখাদ অনুগত। মেজর জিয়া ছিলেন সবদিক থেকেই ওই পদের উপযুক্ত।

আমার উপরের দাবী অনেকের কাছে অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু ইতিহাস কখনও অদ্ভুত কথা বলে না। ইতিহাস সত্যনিষ্ঠ। আমি সত্যনিষ্ঠ সেই ইতিহাসকেই এখানে হাজির করেছি। ইতিহাস সাক্ষি দিচ্ছে, পুরো নয় মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধে মেজর জিয়া তাঁর প্রিয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক মুহূর্তের জন্যেও কোথাও অস্ত্র ধরেন নি। একটি গুলিও ছুঁড়েন নি। বরং যখনই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রকৃত যুদ্ধ শুরুর সময় হয়েছে, ঠিক তখনই সুকৌশলে সে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে অন্যদিকে, অন্য জায়গায় চলে গিয়েছেন তিনি; যুদ্ধ করেছে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর-এর সেনা অফিসাররা।

পরে তাদের সেই কৃতিত্ব ছিনতাই করেছেন তিনি-অবলীলায়। আমার মত বেসামরিক লোক – সে সময়ে যাঁরা মেজর জিয়ার কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেছেন – তাঁরা ছাড়াও সেনাবাহিনীতে তাঁর সহযোদ্ধারাও আমার উপরের দাবীকে সমর্থন করে প্রামাণ্য দলিল রেখে গেছেন ইতিহাসের পাতায়, যা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে যথাযথভাবে।

এ গ্রন্থটি ২০০৫ সালে বেগম জিয়ার প্রধানমন্ত্রীত্বকালে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোছলেম উদ্দিন আহমদ প্রথম প্রকাশ করেছিলেন এবং ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। পরদিন বাংলাদেশের সব জাতীয় পত্রিকায় এ প্রকাশনা উৎসবের সচিত্র প্রতিবেদন বের হয়েছিল। সকলের ধারণা ছিল– মেজর জিয়ার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগগুলোর যথাযথ ব্যাখ্যা বা প্রতিবাদ করবে বিএনপি সরকার। কিন্তু খুবই বিস্ময়কর ঘটনা সরকার প্রতিবাদ বা ব্যাখ্যা করার কথা দূরে থাক, টু শব্দটি করতেও সাহস করেনি।

বলাকা প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী জামাল উদ্দিন বইটি পড়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাঠকের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবধর্মী করে বইটি প্রকাশ করতে হবে। তারই ধারাবাহিকতায় এর বর্তমান বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হল।

সিরু বাঙালি

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে মেজর জিয়ার ভূমিকা ছিল খুব সামান্য ও সীমাবদ্ধ। যেই ব্যাপক অর্থে মেজর জিয়া বর্তমানে বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বড় রকমের স্থান দখল করেছেন, ইতিহাস সাক্ষি দিচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর অবদান সেরকম জোড়ালো ও ব্যাপক ছিল না। এ ব্যাপারে আমি আমার প্রত্যক্ষ করা মেজর জিয়ার কার্যকলাপ ছাড়াও তাঁর সতীর্থ ও সহযোদ্ধা সেনা অফিসারদের লিখিত বর্ণনা, এমন কী চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্ব নিয়ে মেজর জিয়ার নিজের লিখিত বক্তব্য ও দাবীনামাসমূহও যথাযথভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে চেষ্টা করব যে, ওসব ছিল নেহায়েতই মিথ্যাচার, কল্পনাপ্রসূত গালগল্প।

চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা বলতে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত -৮ম বেঙ্গলের সাথে অন্যান্য সাহায্যকারী যোদ্ধাদলের-কার্যক্রমকেই বিবেচনা করা হয়েছে। চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা মূলত ইপিআর বাহিনী এ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপটেন রফিকুল ইসলামের দ্বারা হলেও আমাদের এখনকার আলোচনা কেবল ৮ম বেঙ্গল এবং তার বাঙালি সেনাঅফিসার মেজর জিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ, মেজর জিয়া ও তাঁর সেনা ইউনিট ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে মিথ্যাচার ও অলীকদাবী উত্থাপন করেছেন এবং সুবিধা আদায় করেছেন, তেমনটি আর কেউ করেনি, তাই।

তবে সবার আগে, আমি মনে করি, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় মেজর জিয়াকে আমি যেভাবে দেখেছি, সর্বাগ্রে সেটাকেই পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা দরকার। কেননা, ২৫ মার্চ যুদ্ধ শুরুর প্রায় ৩৬ ঘণ্টা আগে থেকেই মেজর জিয়াকে আমি চিনতে শুরু করেছিলাম একজন বদমেজাজী পাকিস্তানের অনুগত সেনাঅফিসার হিসেবে। যা পরবর্তীকালে নিরঙ্কুশভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসলে তিনি ছিলেন একজন প্রকৃতই পাকিস্তানি অনুগত সৈনিক। শুধু তাই নয়, তার কার্যক্রম থেকে পরবর্তীতে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগই দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধকে বিভ্রান্ত করার জন্য। শেষ পর্যন্ত তাতে তিনি সফলও হয়েছিলেন শতভাগ। আসুন, এবার আমরা পাকিস্তানের প্রতি অনুগত সেই সৈনিকটির অবয়ব দেখি। চট্টগামের ষোলশহর ২নং রেল গেইটের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত সিডিএ মার্কেটে

(বর্তমানে চট্টগ্রাম শপিং কমপ্লেক্স হিসেবে পরিচিত) অবস্থিত ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সেনাঅফিসার মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে আমার প্রথম সরাসরি সাক্ষাৎ ঘটে ২নং রেল গেইটের রোড ব্লকে।

সেদিন ছিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ মঙ্গলবার। একেতো পাকিস্তানের জাতীয় দিবস। তার উপর বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়া খানের ছলনাময়ী বৈঠকের মহড়া। ফলে পূর্ববাঙলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল উত্তপ্ত বারুদের উপর।

সারাদেশের মাঝে চট্টগ্রামের অবস্থা ছিল নাজুক। পাকিস্তানি সমর্থক বিহারী অধ্যুষিত হালিশহর, অয়্যারলেস, সরদার বাহাদুরনগর, শেরশাহ, রৌফাবাদ, অক্সিজেন, এনায়েত বাজার, চট্টেশ্বরী রোড, আসাদগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় ছদ্মবেশে ঘাপটি মেরে থাকা পাকিস্তানি সৈন্য ও বিহারীরা সম্মিলিতভাবে বাঙালি জনসাধারণের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৫০/৬০ জন বাঙালিকে হত্যা করার খবর ছড়িয়ে পড়লে চট্টগ্রামের পরিস্থিতি আনবিক বোমা বিস্ফোরণের রূপ ধারণ করে।

২৩ মার্চের সেরকম একটি বিস্ফোরণোন্মুখ সময়ে আমরা ক'জন ২০/২৫ বছর বয়সী টগবগে তরুণ ষোলশহর ২নং রেল গেইটে বায়েজিদ বোস্তামী রোডের উপর একটি ৮ বগিসম্পন্ন মালবাহী রেলওয়াগন দিয়ে রোড ব্লক করে তা পাহারা দিচ্ছিলাম।

সন্ধ্যা তখন প্রায় সাড়ে সাতটা হবে। মার্চ মাসের সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা মানে সূর্য ডোবার অব্যবহিত পর। অন্ধকার নেমে এসেছে। তবে তা গাঢ় নয়। মানুষের অবয়ব দেখা যায়। ঠিক সেসময় চট্টগ্রাম নতুনপাড়া সেনানিবাসের দিক থেকে একটি জিপ নিয়ে একজন সামরিক অফিসার এসে আমাদের রোড ব্লকের সামনে দাঁড়াল। জিপের পেছনে দু'জন সাধারণ বাঙালি সৈনিক। ড্রাইভার পাঞ্জাবী।

রেল ওয়াগান দিয়ে রোড ব্লক। সুতরাং সামরিক সেনা অফিসারটি জিপ থেকে নামতে বাধ্য হলেন। কালো ও মাঝারি গড়নের সেই সেনাঅফিসারটি জিপ থেকে নেমে খটাখট্ শব্দ তুলে জোরকদমে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন, **রেলক্রসিং থেকে ওয়াগান সরাও। আমাকে রাস্তার ওদিকে যেতে হবে।**

মুখে বাংলা বুলি শুনে আমরা যারপর নাই আনন্দিত হলাম, বাঙালি সেনাঅফিসার যখন, তখন অবশ্যই আমাদের পক্ষের লোক হবে; ভাবলাম আমরা। আমাদের দলের একজন বলল, রেল ওয়াগান সরানো যাবেনা। কোনও পাকিস্তানি সৈন্যবাহী গাড়িকে ওপারে যেতে দেয়া হবে না।

বাঙালি সেনাঅফিসার চোখ কটমট্ করে আমাদের দিকে চাইলেন। সঙ্গে পাঞ্জাবী ড্রাইভারটি পারলে আমাদের চিবিয়ে খায়। কিন্তু আমরা তখন স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত। ওসব চোখ রাঙানি থোড়াই কেয়ার করি।

আমাদের সঙ্গের এক প্রতিবাদী যুবক উচ্চকণ্ঠে বলল, চোখ রাঙাচ্ছেন কেন?

আপনিওতো আমাদের মতো বাঙালি। বোঝেন না, দেশের হালচাল?
কালোবরণ সেনাঅফিসারটি রেগে গেলেন বলে মনে হল। পেছনের সিটে বসা বাঙালি সাধারণ সৈনিক দু'জনও এবার নেমে এলেন গাড়ি থেকে। এসেই অফিসারের দু'পাশে দু'জন দাঁড়াল। কালোবরণ অফিসার রাগান্বিত কণ্ঠে আমাদেরকে বললেন, **চুপ কর। কথা বাড়িও না। রেল ব্যারিকেড সরাও। আমাদের যেতে দাও।**
তিনি আমাদেরকে এমনভাবে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, শুনে মনে হচ্ছিল, আমরা যেন তারই অধীনস্থ সৈন্য। তাঁর হাবভাব ও হম্বিতম্বি দেখে আমাদের মাথায় খুন চেপে গেল। আমরা সকলে সমস্বরে চিৎকার করে বললাম, রেল ব্যারিকেড সারানো হবে না। কোনও পাকিস্তানি সৈন্যবাহী যানবাহনকে শহরের দিকে যেতে দেয়া হবে না। আমাদের জান গেলেও না।
আমাদের মত তাঁর গলাও সপ্তমে উঠল। তিনিও চিৎকার করে বললেন, **জানো, আমি কে?** এ পর্যন্ত বলে তিনি তাঁর পেছনে দাঁড়ানো সৈন্য দু'জনের দিকে পলকের জন্য চাইলেন। তারপর বললেন, **আমার নাম মেজর জিয়াউর রহমান। আমি ষোলশহর সিডিএ মার্কেটে অবস্থিত ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমাণ্ড। দরকারি কাজে আমাকে আমার স্টেশন ছেড়ে কোয়ার্টারে যেতে হবে। ব্যারিকেড হঠাও।**
আমরা বললাম, আপনি মেজর জিয়াউর রহমান হন, আর জেনারেল ইয়াহিয়া খান হন, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। রেল ক্রসিং-এর ওপারে কোনও সামরিক যানবাহন যেতে পারবেনা। আমাদের শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে এটা ঘটবে না।
আমাদের সকলের সম্মলিত চিৎকারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেই সেনাঅফিসারটি যে দারুণভাবে ক্ষেপে গেলেন, সেটা তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা গেল। ভীষণ রুক্ষ ও রূঢ় ভাষায় তিনি আমাদেরকে এর পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেন, **তোমরা অপরিণামদর্শী যুবক। এর খেসারত তোমাদেরকে দিতে হবে। তৈরী থেকো।**
এই বলে তিনি তাঁর জিপ নিয়ে দ্রুত চট্টগ্রাম সেনানিবাসের দিতে চলে গেলেন।
বাঙালি হয়েও বাঙালি জাতির গৌরবজনক কার্যের প্রতি একজন বাঙালি সেনাঅফিসারের এহেন রুক্ষ ও রূঢ় আচরণ আমাদেরকে দস্তুরমত বিস্মিত ও হতভম্ব করল। মেজর জিয়াউর রহমান নামের পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অনুগত এই বাঙালি সেনাঅফিসার ব্যারিকেড স্থান ত্যাগ করার পর স্থানীয় বহুলোক আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নানা রকম মুখরোচক আলোচনায় অংশ নিল।
এরপরদিন ২৪ মার্চ বুধবার দুপুরে, ষোলশহর সিডিএ মার্কেটে অবস্থিত ৮ম বেঙ্গলের সাধারণ বাঙালি সৈনিক, যাঁদের সঙ্গে আমার জানাশোনা ও বন্ধুত্ব হয়েছিল, যারা সময়ে অসময়ে ২নং গেইটের মোড়ে আব্বাস ভাই [আব্বাস ভাই-ওমরগণি এম.ই.এস
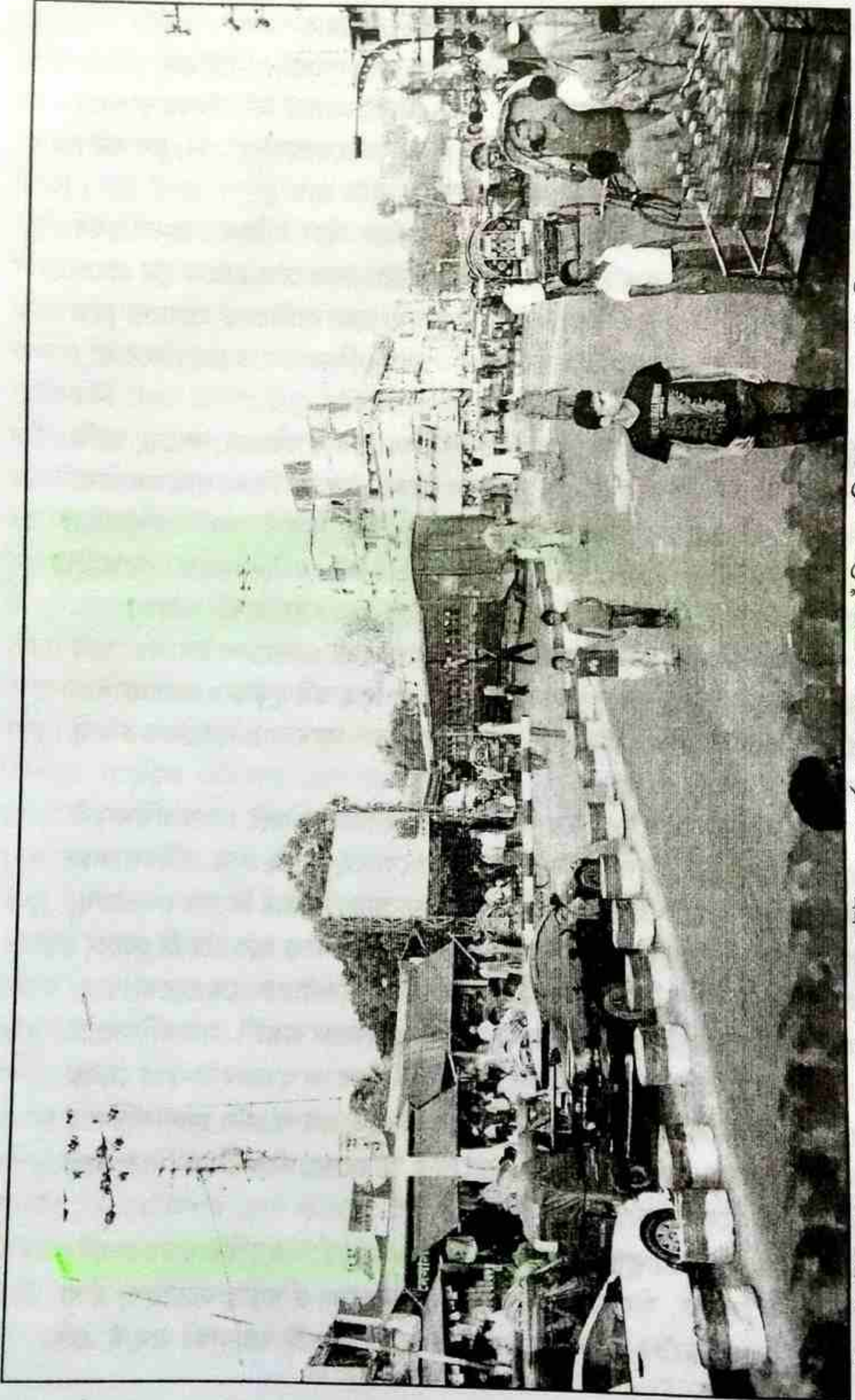
এই সেই ঐতিহাসিক ষোলশহর ২নং রেল গেইট। ২৩ মার্চ, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের অনুগত সৈনিক মেজর জিয়াউর রহমান চোখ রাঙিয়ে ব্যারিকেড হঠাতে হুকুম দিয়েছিল।

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-দাতা, জনাব ওমর গণি সাহেবের প্রথম পুত্র]-এর মুদির দোকানে এসে আড্ডা জমাতো, তাদেরই একজনের কাছে জানতে চাইলাম, মেজর জিয়াউর রহমান নামে কোনও সেনাঅফিসার তাদের ইউনিটে আছে কিনা?
তাঁরা স্বীকার করল, সত্যিই ওনামে একজন সিনিয়র বাঙালি অফিসার তাদের ইউনিটে রয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, ওদিনই আমরা প্রথমবারের মত জানলাম মেজর জিয়া ছাড়াও মেজর মীর শওকত আলী নামে আরও একজন বাঙালি সেনাঅফিসার সম্প্রতি ৮ম বেঙ্গলে যোগ দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, ক্যাপটেন অলি আহমদের কথা আগে থেকেই আমাদের জানা ছিল। ক্যাপটেন অলি ৮ম বেঙ্গলের কোয়ার্টার মাস্টার ছিলেন। তবে এই প্রসঙ্গে সকলের একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এখন যেমন বাচ্চা ছেলেও বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, সেনাঅফিসার এমন কী সেনাইউনিট সম্পর্কে যে ধরনের খোঁজ-খবর রাখে, পাকিস্তান আমলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা সেনাইউনিট সম্পর্কে তেমনটি জানার কোনও সুযোগ ছিলনা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়মকানুন ছিল খুবই কড়া। তদুপরি একাত্তর খ্রিস্টাব্দে আমার বয়সও ছিল মাত্র সাড়ে ২২ বছর। অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিজ্ঞানও ছিল কম। সে কারণে, ৮ম বেঙ্গলের অনেক সাধারণ সৈনিক, নায়েক, সুবেদার জাতীয় ননকমিশনড্ অফিসারদের সাথে পরিচয় ঘটলেও, সিনিয়র কারও সাথে পরিচয় হবার সুযোগ ঘটেনি। দরকারও পড়েনি। যার কারণে, মেজর জিয়া বা মেজর শওকতদের মত সিনিয়র বাঙালি সেনানায়কদের সম্পর্কে কিছুই জানা হয় নি।
২৩ মার্চ সন্ধ্যার পর মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আমাদের আর দেখা হয় নি। ষোলশহর ২নং গেইটে দেয়া আমাদের রোড ব্লক সরাতে তিনি আর আসেন নি। তবে ২৩ মার্চ সন্ধ্যায় তাঁর সাথে আসা সেই দু'বাঙালি সৈনিকের একজন, ছিপছিপে, হালকা-পাতলা গড়ণের শ্যামলাবরণ-যুবকের নেতৃত্বে একদল পাকিস্তানি সৈন্য আবার ২নং রেল গেইটের রোড ব্লক সরাতে এসেছিল ২৪ মার্চ দুপুরে। পরে জেনেছি, সেই শ্যামলাবরণ যুবকটির নাম লে. শমসের মবিন চৌধুরী।
মেজর জিয়ার সাথে আমার দ্বিতীয়বার দেখা হয় ২৬ মার্চ বিকেলে পটিয়া থানার হুলাইন আমিন শরীফ চৌধুরী প্রাইমারী স্কুলের প্রাঙ্গণে। সেখানে পরে আসছি।
২৫ মার্চ রাত সাড়ে ১১টায় চট্টগ্রামস্থ নতুনপাড়া সেনানিবাসে ঘুমন্ত বাঙালি সৈনিকদের উপর পাকিস্তানি হায়েনা সৈন্যরা নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করছে, এ খবর জানার পর, মেজর জিয়া তাঁর ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২৫০ জন সৈন্য, সমুদয় গোলাবারুদ ও যানবাহন নিয়ে রাত ৩টার সময় ষোলশহর স্টেশন হেড্ কোয়ার্টার ত্যাগ করে কালুরঘাটের দিকে পালিয়ে যায়।
আমরা যারা ষোলশহর ২নং গেইটের আশেপাশে অবস্থান করছিলাম, তাঁদের ধারণা

ছিল, মেজর জিয়ার নেতৃত্বে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট নতুনপাড়া সেনানিবাসে আক্রান্ত, আহত ও আটকে পড়া বাদবাকী বাঙালি সৈন্যদের উদ্ধারে এগিয়ে যাবে। পরে জেনেছি, এখানকার মৃতপ্রায় সৈনিকরাও আশা করেছিল মেজর জিয়ার দল তাদের উদ্ধারে এগিয়ে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য আক্রান্ত ও আটকে পড়া নতুনপাড়া সেনানিবাসের বাঙালি সৈনিকদের; মেজর জিয়ার ৮ম বেঙ্গল তাঁদের উদ্ধারে এগিয়ে যাবার কথা দূরে থাক, চট্টগ্রাম শহরের অন্য কোথাও এ্যাম্বুশ করা বা প্রতিরোধ গড়ে তোলাও নিরাপদ মনে করে নি। তারা প্রাণ-বাঁচাতে চলে গেল প্রত্যন্ত গ্রামে। যেখানে কোনও যুদ্ধ নেই, কোনও ভয় নেই।

অবশ্য ৮ম বেঙ্গল যে, রাতের আঁধারে পালিয়েছে, আমরা সেটা বুঝতে পেরেছি ২৬ মার্চ ভোর ৫টায়।

২৫ মার্চ নতুনপাড়া সেনানিবাসের দিক থেকে আসা গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দের কারণ কী জানার জন্য আমরা ভোর ৫টার সময় ষোলশহর ২নং রেল গেইটের দক্ষিণে যে বালুকাময় মাঠটি ছিল, সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। আমরা দেখলাম, সারা গায়ে কাটাছেঁড়ার দাগ, আধাউলঙ্গ, কেউ গামছা পড়া, কেউ লুঙ্গি পড়া – উদ্‌ভ্রান্ত কিছু বাঙালি সৈন্যকে ঘিরে মানুষের জটলা। কাছে গিয়ে জানতে পারলাম, ওরা সেইসব হতভাগ্য সৈনিক, যারা নতুনপাড়া সেনানিবাস থেকে প্রাণ নিয়ে পাকিস্তানি হামলা থেকে বেঁচে এখানে পালিয়ে এসেছে ৮ম বেঙ্গলের কাছে।

অনেক আশা নিয়ে ওরা এসেছে ৮ম বেঙ্গলে। এসেছে খাদ্য-বস্ত্র ও অস্ত্রের জন্য। এসেছে ৮ম বেঙ্গলকে সঙ্গে নিয়ে নতুনপাড়া সেনানিবাসে আটকে পড়া বাঙালি সৈন্যদের উদ্ধারে এগিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু হায়! সবই দুরাশা। ৮ম বেঙ্গলের স্টেশন হেড্ কোয়ার্টারে কেউ নেই। কিছুই নেই। সব হাওয়া। বাঙালি মুখরিত একটি মিনি ক্যান্টনমেন্ট এখন সম্পূর্ণ ফাঁকা।

সৈন্যদের মুখে সিডিএ গোডাউন ফাঁকা। সেখানে বাঙালি সৈন্যরা নেই, একথা শুনে আমরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। এবার নিজের চোখে দেখলাম। এবং থ হয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম না কেন এমন হল। কোনও যুদ্ধ না, গোলগুলি না, কোনও আক্রমণ না, প্রতি আক্রমণ না; কী এমন ঘটনা ঘটল যে, এতবড় একটি সুসজ্জিত সেনাদল রাতের আঁধারে পালাতে বাধ্য হল?

খোঁজ নিয়ে জানা গেল ৮ম বেঙ্গল রাত ৩টা থেকে সাড়ে ৩টার দিকে রেলরাস্তা ধরে সৈনিকরা, গাড়ির রাস্তা ধরে অফিসাররা, দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা পথিকেরমত পালিয়েছে পূর্বদিকে। আমি নিজে নতুনপাড়া থেকে অষ্টম বেঙ্গলের কাছে সাহায্যের জন্য আসা কিছু সৈন্যকে পূর্বদিকে কালুরঘাট ব্রীজ পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম। সেখানেই আমি জানলাম, মেজর জিয়ার সেনাদল বোয়ালখালীর করলডেঙ্গা পাহাড়ের দিকে চলে গেছে।
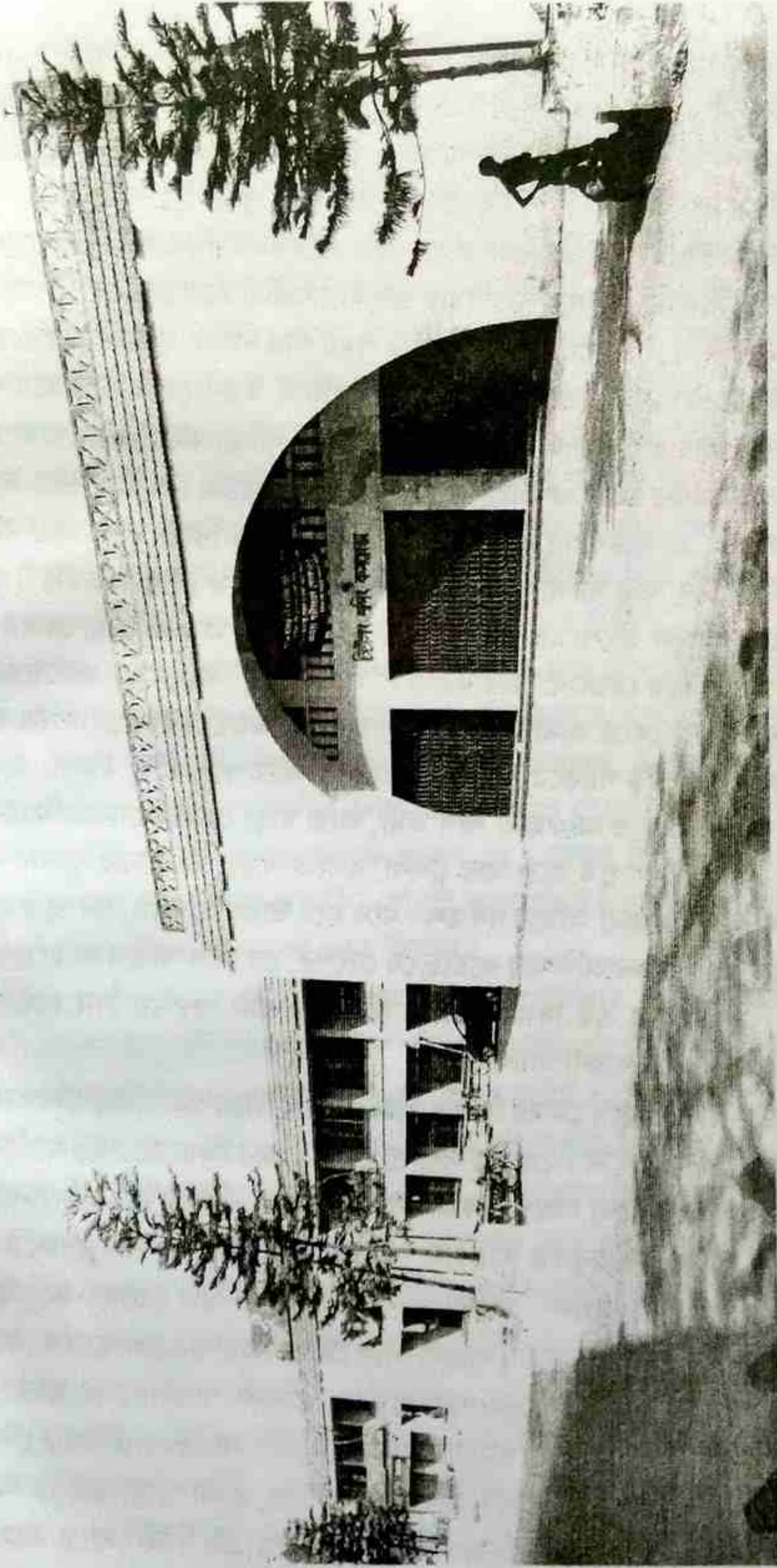
এই সেই ঐতিহাসিক ষোলশহর সিডিএ মার্কেট। ১৯৭১ সালের ৮ম বেঙ্গলের মিনি ক্যান্টম্যান্ট। পাকিস্তানি ট্যাঙ্ক-কামানের ভয়ে ২৫ মার্চ রাত দুপুরে সেখান থেকে দলবল নিয়ে পালিয়ে পৈত্রিক প্রাণ বাঁচিয়েছিল মেজর জিয়া]

দুই

২৬ মার্চ দুপুর আড়াইটায় চকবাজার প্যারেড কোনায় অবস্থিত আইবিপি পেট্রোল পাম্পে তেল নিতে আসা ছাত্রলীগের এক কর্মীর কাছে জানতে পারলাম যে, মেজর জিয়ার সেনাদলটি বোয়ালখালী থানার কদুরখীল বড়ুয়াপাড়া প্রাইমারী স্কুল থেকে ক্যাম্প গুটিয়ে হুলাইন আমিন শরীফ চৌধুরী প্রাইমারী স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে।

একথা শুনে ছাত্রলীগের ওই কর্মীর পিকআপের পেছনে লাফ দিয়ে আমি উঠে পড়লাম। বিকেল সাড়ে তিনটায় পটিয়ার পাঁচরিয়ায় ছাত্রলীগ কর্মীটি আমাকে তাঁদের পিক আপ থেকে নামিয়ে দিল। পাঁচরিয়া থেকে হুলাইন পথর খাঁর দীঘির পাড়ে অবস্থিত আমিন শরীফ চৌধুরী প্রাইমারী স্কুলে আমি যখন পৌঁছালাম তখন দেখি সাঙ্গ প্রায় শেষ। অর্থাৎ মেজর জিয়ার সেনাদল ওই স্থান ত্যাগ করে পটিয়া সদরে চলে যাবার জন্য তৈরী। সবাই মেজর জিয়া ও তার দলকে সংবর্ধনা জানাচ্ছে। মেজর জিয়া সাধারণ মানুষের সালাম ও সংবর্ধনার জবাবে মুষ্টিবদ্ধ হাত উপর দিকে তুলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিচ্ছিলেন "জয় বাংলা" বলে। হুলাইন আমিন শরীফ চৌধুরী প্রাইমারী স্কুলের হেড মাস্টার আবুল হাশেমের সাথে বিদায়ী কোলাকুলী করার সময় মেজর জিয়া আবেগে আপ্লুত হয়ে যেভাবে "জয় বাংলা" "জয় বঙ্গবন্ধু" বলে হেড মাস্টারের পিঠ চাপড়ে দিলেন, তা দেখে আমার চক্ষু চকড়গাছ। সে সময় মেজরের ক্লীনসেভ গালের গোড়া ফেটে সব দাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ছিল আবেগের আতিশয্যে।

আমরা যারা ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ কর্মী, তারা ছাড়া কোনও সেনাঅফিসার এত জোরে ও এত আবেগাপ্লুত হয়ে 'জয় বাংলা' বলতে পারে, এ আমার জানার বাইরে ছিল। মেজর জিয়ার জন্য আমার গর্ব হল। মনে মনে ভাবলাম আমি, বঙ্গবন্ধুর সমর্থনে এমন আবেগপ্রবণ সেনাঅফিসার রয়েছে যে দেশের, সে দেশ স্বাধীন না হয়ে থাকতে পারে না। ২৬ মার্চের এই দিনটি আমার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে বলে আমি মনে মনে ধারণা করলাম।

গাড়িতে উঠে বসার আগে মেজর জিয়ার সামনে আমি দাঁড়ালাম। কিন্তু দেখলাম তিনি আমাকে চিনতে পারেন নি। ২৩ মার্চ সন্ধ্যায় দেখা মেজর জিয়া আর ২৬ মার্চ বিকেলে দেখা মেজর জিয়ার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করলাম। ওদিন তিনি ছিলেন রাগী ও বদমেজাজী পাকিস্তানি অনুগত অফিসার। ২৬ মার্চের জিয়া ছিলেন পুরোপুরি বঙ্গবন্ধু ও জয় বাংলার অন্ধ সমর্থক। পটিয়া সদরের উদ্দেশ্যে ৮ম বেঙ্গল, কাপ্তাই থেকে আসা ইপিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনী নিয়ে মেজর জিয়া রওয়ানা হলেন। অনেকের মাঝে আমি একটি মুখ খুঁজলাম। শ্যামলাবরণ, হালকা-পাতলা সেই যুবক বাঙালি সেনাঅফিসারটি, যাঁর নাম লে. শমসের মবিন চৌধুরী। না কোথাও তাঁকে দেখা গেল না। ইচ্ছে ছিল, দেখা হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম, কেন তাঁরা রাতের অন্ধকারে ষোলশহর সিডিএ গোডাউনের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে এই নির্জন গ্রামে এসে আশ্রয়

নিলেন। যুদ্ধ চলছে শহরে। প্রচণ্ড যুদ্ধ। তারা যুদ্ধ না করে কেন গ্রামে পালালেন? না, শেষ পর্যন্ত কিছুই জানা হল না। ওদিনই আবার শহরে ফেরৎ এলাম আমি। মিলিটারী পুল থেকে সাম্পানে চাক্তাই। সেখান থেকে সোজা বহদ্দারহাটের পূর্বদিকে চান্দগাঁও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। সন্ধ্যে সাতটায় সেখান থেকে ফিরে গেলাম প্যারেড কোনায়। বড়ভাই আহমদ কবির খানের আস্তানায়। ৩০ মার্চ পর্যন্ত ওটাই ছিল আমার আশ্রয়স্থল। ২৭ মার্চ শনিবার দুপুরের পর আবার আমি চান্দগাঁও স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে গেলাম। সেখানে বিস্তর লোকের কোলাহলে চারদিক গমগম করছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার চালু হয়েছে জেনে স্বাধীনতা প্রিয় মানুষের আনন্দ আর ধরে না। সাধারণ মানুষের সাথে আজ কিছু সামরিক বাহিনীর সদস্যকেও দেখতে পেলাম। গতকাল ওদেরকে দেখিনি। আমি ট্রান্সমিশন সেন্টারে পৌছার ঘণ্টাখানেক পর দেখলাম তিন লরি সৈন্যসহ মেজর জিয়া সম্প্রচার কেন্দ্রে প্রবেশ করলেন। মেজর জিয়াকে সাধারণ মানুষেরা কেউ চিনতে পারল না। তারপরও সামরিক পোশাক পড়া একজন বাঙালি মেজরকে দেখে সবাই উৎফুল্ল হল এবং সবাই তাকে ঘিরে ধরল।

মেজর জিয়া জিপ থেকে নেমেই চারদিকে এত লোকজন দেখে বেশ হম্বিতম্বি করলেন। সামরিক বাহিনীর একজনকে হুমুক দিলেন ফালতু লোকজনকে বেতার কেন্দ্রের বাইরে বের করে দেবার জন্য। তিনি আরও নির্দেশ জারি করলেন, এখন থেকে বেতার সম্প্রচার কেন্দ্রকে সামরিক বাহিনীর লোকেরাই পাহারা দেবে। সামরিক বাহিনীর পাশ ছাড়া কেউই কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না। মেজর জিয়ার আদেশ সঙ্গে সঙ্গেই পালিত হল। লে. শমসের মবিন চৌধুরী অপ্রয়োজনীয় সব লোককে ঝেঁটিয়ে বের করে দিলেন। আমাকেও বের করে দিলেন।

মেজর জিয়া ও লে. শমসের মবিনকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম আমি। খুব করিৎকর্মা লোক হিসেবেই সকলের কাছে প্রতিভাত হচ্ছিলেন তাঁরা। অথচ মাত্র ৩৬ ঘণ্টা আগে চট্টগ্রাম শহরের ২০ লক্ষ লোক ও নিজের সতীর্থ ২০০০ বাঙালি সৈনিককে নতুনপাড়ায় মৃত্যুর মুখে ফেলে, অরক্ষিত রেখে, নিজেদের প্রাণ নিয়ে পালাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি তাঁরা। আসলে মেজর জিয়া আগাগোড়াই এমনটি করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে, অর্থাৎ ২৫ মার্চ রাত থেকে ৩০ মার্চ বিকেল সাড়ে তিনটায় চট্টগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অধীনস্থ সেনাদলকে পেছনে ফেলে রামগড়ে পালানোর আগ পর্যন্ত মেজর জিয়াকে কিছুই করতে হয় নি। এক মুহূর্তের জন্যও শত্রুর বিরুদ্ধে বন্দুক হাতে নিতে হয় নি তাঁকে। কোথাও কোনও প্রতিরোধ করতে হয় নি। কোনও আন্দোলনে যেতে হয় নি। তারপরও তিনি সবকিছুতে ছিলেন, আছেন। কারণ, আগেই বলেছি, একটা সুদূরপ্রসারী মিশন নিয়েই মেজর জিয়া মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, এবং তাতে তিনি সফলও হয়েছিলেন শতভাগ। সে প্রমাণে পরে আসছি।
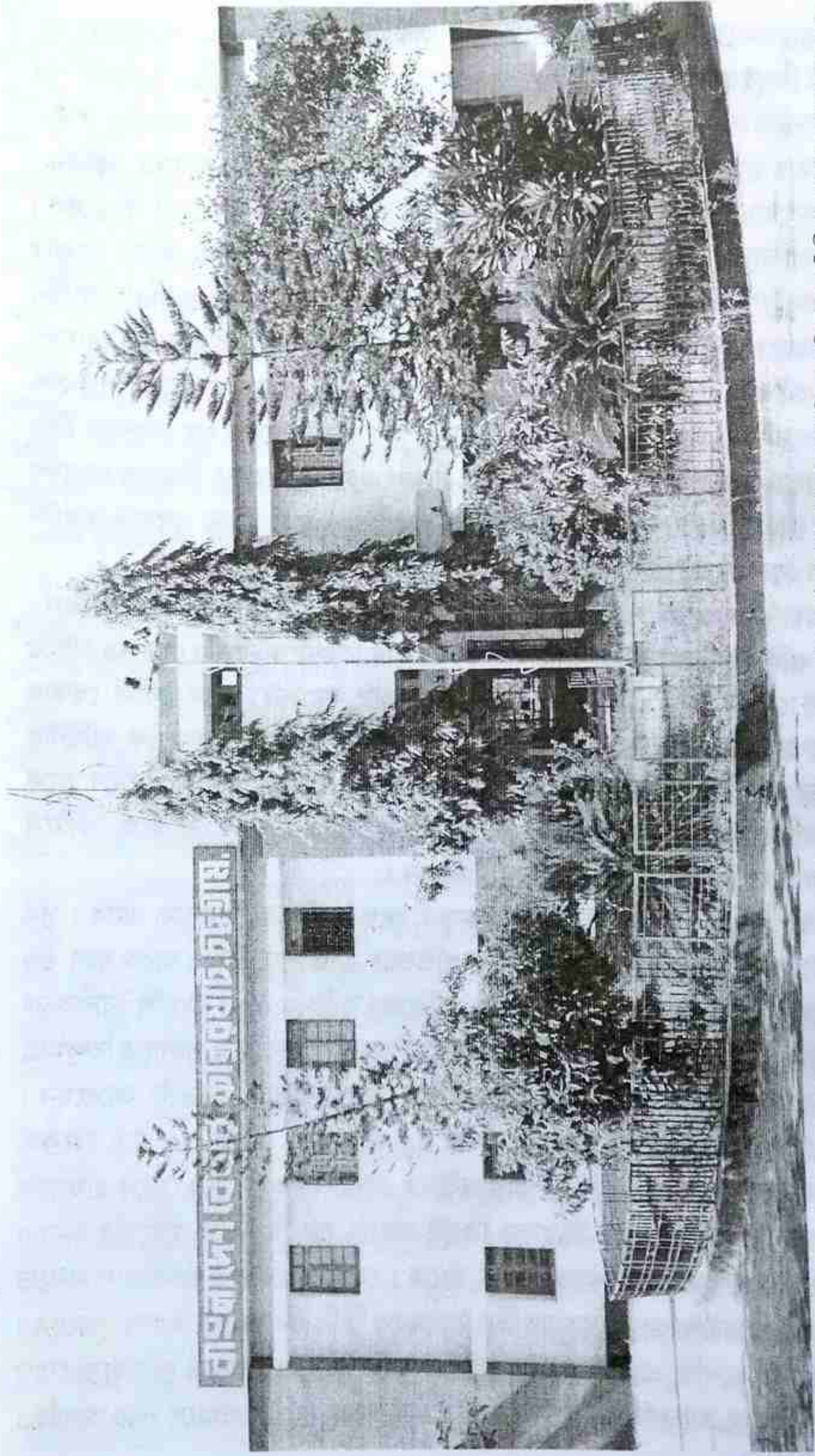
[এই সেই ঐতিহাসিক স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র; ৩০ মার্চ দুপুর ২টা থেকে ২.৩০ মি. পর্যন্ত আধাঘন্টা ধরে পাকিস্তান বিমান বাহিনী যেখানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। যার তীব্রতা ও ব্যাপকতা দেখে ভীত-সন্ত্রস্থ মেজর জিয়া, তার অধস্থন সকল সৈন্যকে পেছনে ফেলে মাত্র ১ ঘণ্টার নোটিশে পৈত্রিক প্রাণ নিয়ে রামগড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।]

তিন

২৬ মার্চ পুরোদিন মেজর জিয়া ও তাঁর দল চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী-পটিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে শুয়ে বসে দিন কাটালেন। ২৭ মার্চ বিকেল ৩টা পর্যন্ত কাটালেন পটিয়া থানা সদরের ডাক বাংলোয়। তারপরও আজ মেজর জিয়া ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকারী হিসেবে জোর দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বের ভয়াবহতম যুদ্ধ-৯ থেকে ১১ এপ্রিলের কালুরঘাটযুদ্ধে- তিনি উপস্থিত না থেকেও তিনি আজ কালুরঘাটের মহানায়ক বনে বসে আছেন।

বলাবাহুল্য, ৩০ মার্চ দুপুর আড়াইটার সময় চান্দগাঁওস্থ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের উপর পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর স্যাবর জেট থেকে প্রচণ্ড রকম গোলাবর্ষণের দৃশ্য দেখে ভীতসন্ত্রস্থ মেজর জিয়া, মাত্র এক ঘণ্টার নোটিশে, বিকেল সাড়ে তিনটায় চট্টগ্রামকে পেছনে ফেলে ভারতের যাবার নাম করে রামগড়ে পালিয়ে যান । মেজর জিয়ার হঠাৎ চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তে তাঁর সঙ্গীয় ফোর্সরা যারপর নাই বিস্মিত ও হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। তবে কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পায় নি। কেউ বলে নি, আপনি চলে গেলে আমাদের কী হবে?

আমার দুর্ভাগ্য কী সৌভাগ্য জানি না। ৩০ মার্চের পর মেজর জিয়ার সাথে আমার আর দেখা হয় নি। আমি যখন ট্রেনিং-এর জন্য ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাব্রুম মহকুমার হরিণা ক্যাম্পে যাই, তার সাতদিন আগেই মেজর জিয়াকে সেখান থেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর আগরতলায় কংগ্রেস ভবনে মাত্র ২০ মিনিটের ব্যবধানের জন্য মেজর জিয়ার সাথে আমার সাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগটি হাত ছাড়া হয়। আমার জীবনের একটি সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল। আমি মেজর জিয়াকে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। **কেন তিনি ২৫ মার্চ রাত দুপুরে ষোলশহরের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বোয়ালখালী-পটিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন? কেন তিনি নতুনপাড়া সেনানিবাসে আক্রান্ত দুই হাজার মৃত্যুপথযাত্রী বাঙালি সৈন্যকে উদ্ধারে এগিয়ে না গিয়ে সুদূর গ্রামে পালিয়ে এসেছিলেন?**

মেজর জিয়াকে জিগ্যেস করতে পারি নি, তাতে ক্ষতি কী? তাঁর সেদিনের সঙ্গীদের মাঝে মেজর মীর শওকত আলী, ক্যাপটেন অলি আহমদ, লে. শমসের মবিন চৌধুরীরাতো বেঁচে আছেন, তাঁরা কি এই জিজ্ঞাসার জবাবটি দেবেন না?

মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে মেজর জিয়ার সমস্ত কীর্তিকলাপ, আমার মত যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের মধ্যে মেজর মীর শওকত আলী, ক্যাপেটেন অলি আহমদ, ক্যাপটেন হারুণ আহমদ চৌধুরী, লে. মাহফুজুর রহমান, লে. শমসের মবিন চৌধুরী, ক্যাপটেন এনামুল হক চৌধুরী ও ক্যাপটেন রফিকুল ইসলামের লিখিত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ইতিহাসের পাতায় প্রামাণ্য দলিল হিসেবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এমন কী মেজর জিয়ার

কীর্তিকলাপের বিবরণ নিজেই তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন ইতিহাসের পাতায়। যাকে বদলানোর কোনও উপায়ই আজ আর কারুর নেই। আমরা এখন ইতিহাসের সেই প্রামাণ্য দলিল থেকে মেজর জিয়ার সহযোদ্ধার প্রত্যক্ষ বিবরণগুলো উপস্থাপন করে প্রমাণ করার চেষ্টা করব যে, মেজর জিয়া ও তাঁর সেনাইউনিট ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্ব নিয়ে যেসব দাবী উত্থাপন করেছেন তাতে সত্যের চাইতে মিথ্যার দখলদারিত্বই সর্বাধিক।

আসুন, এবার আমরা দেখি এ প্রসঙ্গে মেজর জিয়া ও তাঁর সহযোদ্ধারা কে কী বলেছেন। আলোচনার শুরুতেই আমরা দেখব চট্টগ্রামে স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রথম বিদ্রোহী সেনানায়ক চট্টগ্রাম অঞ্চলের ইপিআর বাহিনীর এ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপটেন রফিকুল ইসলামের বক্তব্যটি। এ বক্তব্য থেকে মেজর জিয়ার ব্যাপারতো বটেই, সঙ্গে আরও এক সিনিয়র বাঙালি সেনা অফিসার, ইবিআরসির প্রশিক্ষক, লে. কর্ণেল এম.আর চৌধুরীর ব্যাপ্যারেও পাঠক অনেক কিছু জানতে পারবেন। মেজর জিয়া যে পাকিস্তানের প্রতি খুবই অনুগত ছিলেন সেটাও পাঠককে নিশ্চিত করবে। ক্যাপটেন রফিকের এই লেখাটি তাঁরই লেখা **"লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে"** গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতঃ

"দিগন্তের শেষ প্রান্ত ছুঁয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে সূর্য ডুবে গেলে নেমে আসে রাত্রির অন্ধকার, আর নেমে আসে এক অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। বাতাসে বারুদের গন্ধ-চারিদিকে গুজব, প্রতিটি মুহূর্ত চরম উত্তেজনায় ভরা এবং এক অজানা আশঙ্কায় আমরা উদগ্রীব। এমনি ছিলো ১৯৭১-এর ২৪শে মার্চের রাত।

শহরের মাঝখানে রেলওয়ে পাহাড়ে আমি একাকী এসে দাঁড়ালাম। রাত তখন ন'টা। পাহাড়ের উপরে এক দোতলা কাঠের বাঙলো থেকে আমি একটু আগেই টেলিফোনে দু'টি 'মেসেজ' পাঠিয়েছি ইপিআর হেড কোয়ার্টার হালিশহরে। আমার গোপন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দু'টো 'মেসেজ'ই ইপিআর অয়্যারলেসের মাধ্যমে উত্তরে শুভপুর থেকে দক্ষিণে টেকনাফ পর্যন্ত সব ইপিআর পোস্টে পাঠিয়ে দেয়া হবে। প্রথম 'মেসেজ'টি ছিলো 'আমার জন্য কিছু কাঠের ব্যবস্থা করো' এবং এর সাথে সাথে আমার দ্বিতীয় 'মেসেজ'টি ছিলো 'আমার জন্য কাঠ নিয়ে আস'।

দু'টো 'মেসেজ'ই পশ্চিম পাকিস্তানিদের সন্দেহ করার মত কিছুই ছিল না। কিন্তু 'মেসেজ' দু'টি পাঠাবার পর আমি যখন একাকী মেঘমুক্ত রাতের আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালাম, তখন একটা অজানা আশঙ্কায় আমি মুহূর্তের জন্য বুঝি শিহরিত হয়ে উঠেছিলাম। এটা কি একটা বিদ্রোহের আবেগময় বহিঃপ্রকাশ মাত্র? আমি কি একটা অসম্ভব কিছু করার চেষ্টা করছি? যা অবশ্যম্ভাবী তা হতেই হবে, সেটা শুধু সময়ের ব্যাপার।
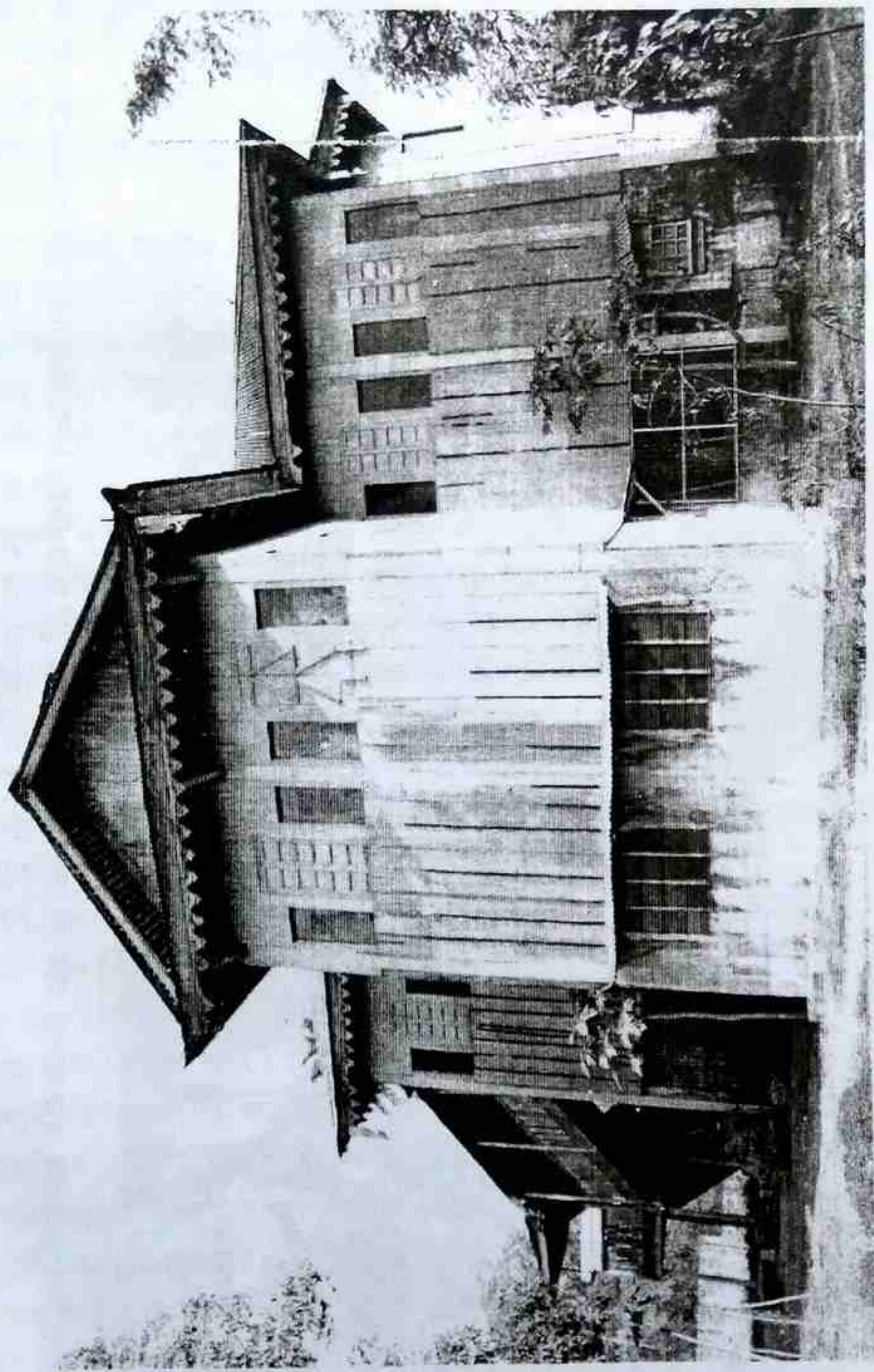
এই সেই ঐতিহাসিক সিআরবি পাহাড়ের কাঠের বাংলো; ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ যেখানে সাময়িক সদর দপ্তর স্থাপন করেছিলেন ইপিআর এ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপটেন রফিকুল ইসলাম।
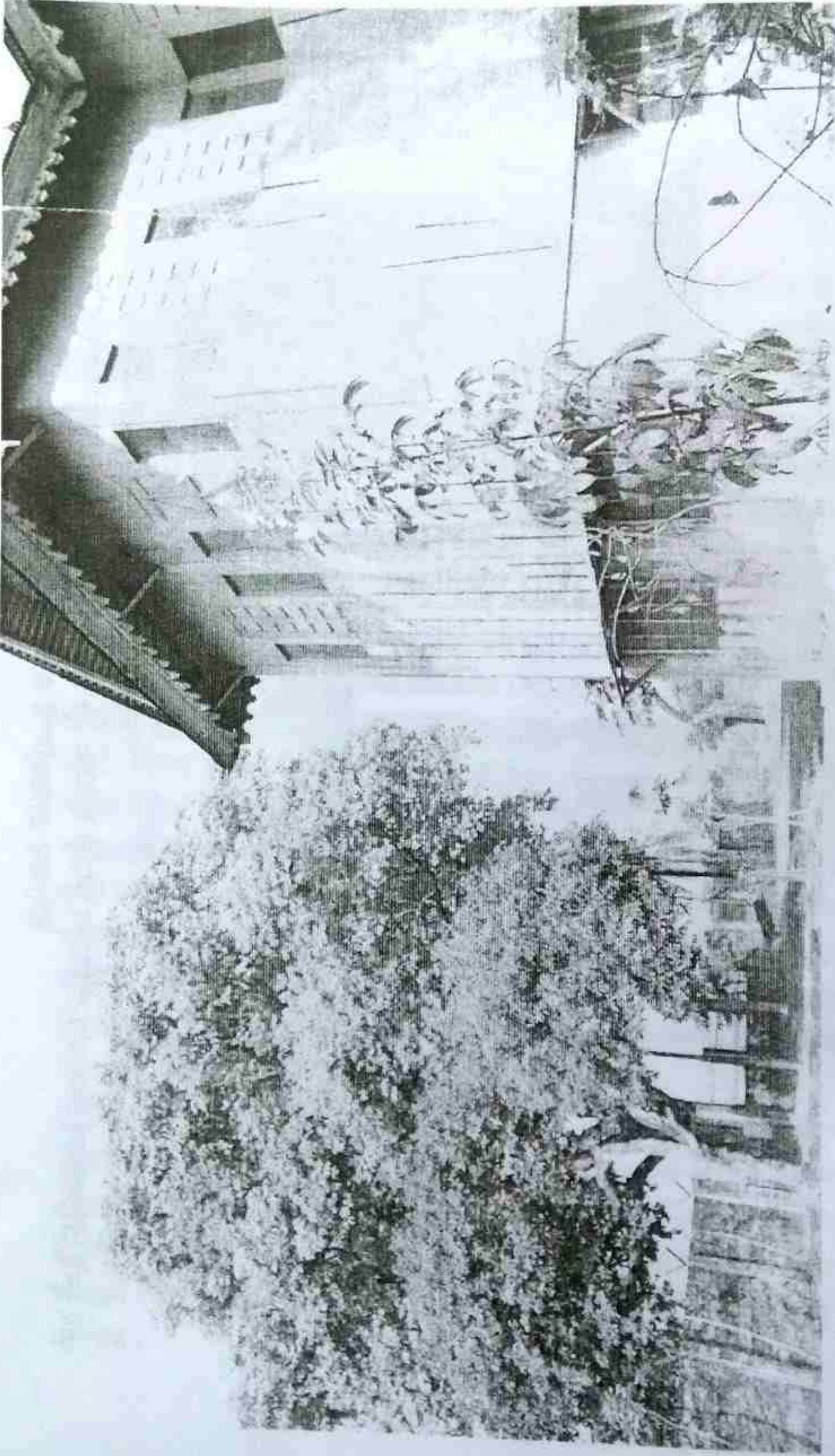
এই সেই ঐতিহাসিক জামগাছ, যার তলায় বসে লে. কর্নেল এম.আর. চৌধুরী আর মেজর জিয়া ক্যাপটেন রফিককে বিদ্রোহ না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন

আমার চিন্তায় বাধা পড়ে। একটা বেবী ট্যাক্সি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠে আমার কাছে এসে থামলো। নেমে এলেন দু'জন বাঙালি সামরিক অফিসার, একজন লে. কর্ণেল এবং অপরজন মেজর। আমরা সেই বাঙলোর সামনে একটা বিরাট জাম গাছের নিচে বসলাম।

'তোমার এখন এ ধরনের কিছু করা উচিত নয়' অত্যন্ত চাপাস্বরে লে. কর্ণেল আমাকে বললেন।

'কেন'? আমি জানতে চাইলাম।

'ওরা আমাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক কোনো ব্যবস্থা নিতে সাহস পাবে না। বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে তারা এমন কিছু করতে পারে না।'

'কিন্তু তারা বিশ্বজনমতের ব্যাপারে কোনো পরোয়াই করে না। তাছাড়া আমরা এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌছেছি যে, আমরা আর কেনোভাবেই ওদেরকে বিশ্বাস করতে পারি না।

কিছুক্ষণ দু'জনেই নিশ্চুপ, গভীর চিন্তায় মগ্ন রইলেন। লে. কর্ণেল একটা ফিতায় ঝুলানো তাঁর আহত বাম হাতটা দেখছিলেন বার বার। মেজর সিগারেট ধরালেন। পাশের কাঠের বাঙলো থেকে কিছু চা এবং খাবার এলো। কিন্তু আমরা কিছুই খেতে পারলাম না। উৎকণ্ঠা আমাদের সমস্ত ক্ষুধাই যেন নষ্ট করে দিয়েছিলো।

'দেখ' লে. কর্ণেল আবার বললেন, 'রাজনৈতিকভাবে আলোচনা চলছে এবং আমরা শুনতে পাচ্ছি কাল অথবা পরশুর মধ্যেই এ ব্যাপারে একটা নিষ্পত্তি হতে যাচ্ছে। এই অবস্থায় তুমি এমন কিছু করতে পারো না যা রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে'।

'মনে করুন আমি যদি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকি?

সেটা হবে বিদ্রোহ, বিপ্লব-তুমি যা খুশি তাই একে বলতে পারো। তুমি যদি বিজয়ী হও ভালো কথা, কিন্তু তুমি যদি জয়লাভ করতে না পারো তাহলে তোমার ভাগ্যে কি আছে তুমি নিশ্চয়ই জান।'

'কিছুটা বিপদের ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে' আমি যুক্তি দেখালাম।

'আমাদের এখন সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করার সময় এসেছে, ওরা আমাদের আঘাত করার আগেই ওদেরকে আঘাত করতে হবে। এটা হতে হবে এখনই এবং এই মুহূর্তে। তা না হলে আর কোনোদিনই পারবো না। আমরা যদি তাদের আগে আঘাত করতে ব্যর্থ হই। তাহলে ওরা আমাদের হত্যা করবে; ওরা এই ভয়াবহ গণহত্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।'

'অতখানি আশঙ্কা করার কিছু নেই, ওরা অমন চরম ব্যবস্থা নেবে না' মেজর বললেন।

'আমিও তাই মনে করি। তুমি তোমার লোকজনকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার থেকে এখন বিরত রাখ।' লে. কর্ণেল বললেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি আবার সেই টেলিফোনে গেলাম। হালিশহরে ফোন করে ইপিআর সৈন্যদের আমার দ্বিতীয় 'মেজেস'টি বাতিল করার জন্য নির্দেশ দিলাম। আমার লোকজনকে বললাম, এই বাতিল আদেশ সাময়িক। তাছাড়া আমার প্রথম 'মেসেজ'টি বাতিল না করে অপরিবর্তিত রাখলাম।

'ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে এদের বিশ্বাস করে আপনারা কি ভুল করছেন না?' আমি আবার লে. কর্ণেল ও মেজরকে বোঝাবার চেষ্টা কালাম। 'ওরাতো আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।' 'তা সত্ত্বেও তুমি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে যে চরম ব্যবস্থার প্রস্তুতি নিয়েছো, এমন একটা ব্যবস্থা নেয়া যায় না,' লে. কর্ণেল বললেন।

'কিন্তু আমরা যদি একটু বুঝে-সুঝে এই ঝুঁকিটুকু না নিই, তাহলে হয়তো আমরা এর চেয়েও বিরাট এক বিপদ ডেকে আনবো'। আমি আবার তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম, তাদের মতলব সম্পর্কে আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কেন তারা বাঙালি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে বদলিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার আনসারিকে এনেছে, কেন তারা নির্বিচারে জেটিতে আমাদের বাঙালিদের হত্যা করছে, কেন 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র এবং গোলা-বারুদ নামাতেই হবে? শত্রু কোথায়? শত্রু কি আমরা নই? আপনারা কি মনে করেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রত্যেক রাত্রে বিমান করে ওরা অন্য কিছু না এনে কমলা আর মাল্টা আনছে? আমি কিছুটা বিদ্রুপের সুরেই কথাগুলো বললাম।

তারপর এক অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে কিছুটা সময় কাটলো। আমি প্রায় নিশ্চিত ভেবে নিয়েছিলাম যে, এদের সাথে আমার আলোচনা করা বৃথা। কারণ, সেনাবাহিনীর কঠিন শৃঙ্খলার নিগড়ে বাঁধা যে কোনো অফিসারের পক্ষে সশস্ত্র বিপ্লব অচিন্তনীয় ব্যাপার যদি না ঘটনার মারাত্মক অবনতি তাঁকে সেই ধরনের চরম ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে। তাই এ দু'জন অফিসার আমাকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে আনতে চাইছিলেন। তাঁরা চিন্তা করেছিলেন তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই দু'জনেই আমার মতো একটা চরম ব্যবস্থা নেয়ার পক্ষে ছিলেন না। কারণ, এতে শুধু যে তাঁদের চাকুরী জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তাই নয়, এমনকি তাঁদের প্রাণদণ্ডও হতে পারে। দু'জন অফিসারই যথেষ্ট মেপে মেপে কাজ করতে চাইছিলেন।

লে. কর্ণেল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'রফিক, তুমি তো জান কি কারণে আমরা এতটা সতর্কতার সাথে চলতে চাচ্ছি। তুমি তোমার ইপিআর সৈন্যদের নিয়ে যেভাবে অস্ত্র ধারণ করতে চাইছো, তা শুধু তোমার একার জন্যই বিপজ্জনক নয়, বরঞ্চ বাঙালি অফিসারদের সেনাবাহিনীতে চাকুরীর ভবিষ্যতেও সংকটময় করে তুলবে।

ফলে তারা সবসময়ই সেনাবাহিনীর প্রতিটি বাঙালি অফিসারকে সন্দেহের চোখে দেখবে। এ অবস্থার শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আমরা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারি না। আর তুমি যদি একাকী নামো, তাহলে হয়তো তুমি কৃতকার্য নাও হতে পারো।'

'আমি বিজয়ী হবো। চট্টগ্রামে পাকিস্তানিদের সংখ্যা মাত্র শ'তিনেকের মতো হবে। আমার অধীনে ইপিআর এর প্রায় পনের শ' বাঙালি সৈনিক আছে। এদের নিয়ে আমি বেশকিছু সময়ের জন্য চট্টগ্রাম দখল করে রাখতে পারবো। এই সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বন্ধু দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা নিশ্চিয়ই করতে পারবেন'। আমি তাদের পুনরায় বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

'তা সত্ত্বেও তোমাকে সংযত হতে হবে। আমি আশাবাদী, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে'। লে. কর্ণেল নিচু গলায় আমাকে বললেন।

'আমাদের অনুপস্থিতি সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে, চলুন আমরা যাই', মেজর কর্ণেলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

আমি শেষ প্রচেষ্টায় আবার বললাম, 'আপনারা তাদের প্রথম আঘাত হানার সুযোগ দিচ্ছেন।'

'ভাবনার কিছু নেই, ওরা এমন কিছু করবে না'।

'সেটা ছাড়া আর অন্য কিছুই হতে পারে না। তারা চরম ব্যবস্থা নেবেই' আমি চাপাস্বরে কিছুটা আক্রোশে বলে উঠলাম, কিন্তু বেবী ট্যাক্সির ইঞ্জিনের আওয়াজে আমার সেই চাপা আক্রোশ ওরা হয়তো শুনতে পেলেন না। তীব্র অসন্তোষ আমি একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়লাম। 'এখন থেকে আমি সম্পূর্ণ একা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার ইপিআর এর সৈন্যদের সহায়তায় কিছু করে যাবো, জনগণ আমাদের সাথে নিশ্চয়ই সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন।' আমি স্বগতোক্তি করলাম।

তখনও রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে পোর্ট এলাকা থেকে গুলির আওয়াজ আসছিলো। কিন্তু আমি পোর্ট এলাকা থেকে এতদূরে যে, বাঙালিদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমি রেলওয়ের পাহাড় ছেড়ে চলে এলাম। রাত গভীর হয়ে এসেছে। আমার কানে তখনও বাজছে ওদের দু'জনার আশ্বাস বাণী, 'তারা কোনো চরম ব্যবস্থা নেবে না।' 'পৃথিবীতে এমন কোনো জঘন্য কাজ নেই যা এরা করতে পারে না' আমি আমার ডাইরীতে সেই রাতে লিখলাম, 'এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত না হানার জন্য আমাদের এই ব্যর্থতার দায়িত্ব ওরা কোনোদিনই এড়াতে পারবে না।' কি আশ্চর্য! তার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। সেছিল ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ এর রাতে। সেই দু'জন অফিসারের একজন লে.

কর্ণেল এম. আর. চৌধুরীকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বন্দি করলো। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানিদের যে বিশ্বাস করেছিলেন ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে সেই বিশ্বাসের জবাব দিলো। অন্য একজন অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান রাত সাড়ে এগারোটায় যাচ্ছিলেন চট্টগ্রাম পোর্টে 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নামিয়ে ক্যান্টমেন্টে আনার কাজে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাহায্য করার জন্যে। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের নিউ মার্কেট শাখার ম্যানেজার জনাব কাদের আমার অনুরোধে ৮ বেঙ্গল রেজিমেন্টের ডিউটি অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে আমার বিদ্রোহ ঘোষণা এবং সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার খবরটা জানালেন। তিনি তাদের আরও জানালেন, যেন ৮ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সবাই আমাদের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান এই খবর পেয়েই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন জিয়াউর রহমানকে ফিরিয়ে আনতে, তিনি ততক্ষণে ষোলশহর ছেড়ে চট্টগ্রাম পোর্টের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।

চট্টগ্রামের প্রথম বিদ্রোহী বীর ক্যাপটেন রফিকুল ইসলামের এ দাবীর ব্যাপারে সকলকে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপটেন রফিক যখন ইংরেজী ভাষায় "Tale of Millions" গ্রন্থটি প্রকাশ করেন তখন মেজর জিয়া বাঙলাদেশ সেনাবাহিনীর উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। **টেল অব মিলিয়নস**-এর বাংলা সংস্করণ **"লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে"** যখন প্রকাশিত হয় তখন মেজর জিয়া বাঙলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি।

লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে প্রকাশের পর সারা বাঙলাদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এমন কী জাতীয় সংসদের অধিবেশনেও এ পুস্তক নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। সাধারণ মানুষ মেজর জিয়ার আজগুবী দাবীনামার ব্যাপারে জেনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়।

তবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল, এ পুস্তকে সরাসরি মেজর জিয়ার দাবীনামার বিরোধীতা ও চ্যালেঞ্জ করা হলেও সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী জেনারেল জিয়াউর রহমান একেবারে চুপ মেরে থাকাটাই শ্রেয়: মনে করেছিলেন।

বাঙলাদেশের সর্বময় ক্ষমতাধর একজন জেনারেলের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এতবড় অভিযোগের কোনওই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে একেবারে চুপসে যাওয়া থেকেই কি প্রমাণিত হয় না যে, উত্থাপিত অভিযোগ সর্বাংশে সত্য? ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ রাত ৯টা পর্যন্ত মেজর জিয়া পুরোপুরিই পাকিস্তানের প্রতি অনুগত ছিলেন এটা কি মিথ্যা? যদি মিথ্যাই হয় তাহলে তিনি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেন না কেন? কোনও বাদ প্রতিবাদ করলেন না কেন? তিনিতো ইচ্ছে করলেই রফিকুল ইসলামের মত একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজরকে মুহূর্তেই ফাঁসিতে ঝোলাতে পারতেন। যেমন করে ঝুলিয়েছিলেন তাঁর প্রাণত্রাতা বীরযোদ্ধা কর্ণেল তাহেরকে।

চার

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা সংখ্যায় প্রকাশের জন্য "দৈনিক বাংলা" পত্রিকা মেজর জিয়ার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিল। সেই সাক্ষাৎকারটি পরবর্তী সময়ে 'বাঙলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র গ্রন্থের ৯ম খণ্ডের ৪০ থেকে ৪৫ পৃষ্ঠায় পুনঃমুদ্রিত হয়।

'সেদিন চট্টগ্রামে যেমন করে স্বাধীনতার লড়াই শুরু হয়েছিল' শিরোনামে লে. কর্ণেল জিয়াউর রহমানের যে সাক্ষাৎকারটি ওই গ্রন্থে গ্রন্থভুক্ত হয়েছে তার থেকে এখন আমরা প্রয়োজনীয় অংশের উদ্ধৃতি তুলে ধরে তার সহযোদ্ধাদের দৃষ্টিতে সে উদ্ধৃত অংশে কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা ও সত্যাসত্য রয়েছে তার বিচার বিশ্লেষণ করব।

উল্লেখিত গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় মেজর জিয়া লিখেছেন-

২২ শে মার্চ। রাত ১১টায় চট্টগ্রাম ইপিআর সেক্টর সদর দফতরের এ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন রফিক এসে দেখা করেন মেজর জিয়ার সাথে। তিনি সরাসরিই বললেন, সময় খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদেরকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেই হবে। আপনার প্রতি আমাদের আস্থা আছে। আপনি বিদ্রোহ ঘোষণা করুন। ইপিআরদের সাহায্য পাবেন। মেজর জিয়া তাঁকে তাঁদের পরিকল্পনার কথা জানান। ইপিআর এর সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা করেন।"

সাক্ষাৎকারে মেজর জিয়ার উপরের দাবীকে সরাসরি নস্যাৎ করে দিয়েছেন তাঁরই অধস্থন জুনিয়র সেনা অফিসার লে. শমসের মবিন চৌধুরী। বাঙলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র গ্রন্থের ৯ম খণ্ডে লে. শমসের মবিন চৌধুরীর যে নিবন্ধটি ছাপা রয়েছে তার ৫৬ পৃষ্ঠায় তিনি মেজর জিয়ার বর্ণিত ঘটনার বিপরীতে লিখছেন এভাবে-

"মার্চের ২২ তারিখ ক্যাপ্টেন হারুন (এসিস্ট্যান্ট উইং কমাণ্ডার, ইপিআর) কাপ্তাই থেকে এসে আমাকে বলল যে, আমাকে মেজর রফিকের (এ্যাডজুট্যান্ট ইপিআর) বাসায় যেতে হবে। ২২শে মার্চ রাতে আমি, ক্যাপ্টেন হারুণ, মেজর খালেকুজ্জামান, ক্যাপ্টেন অলি, মেজর রফিকের বাসায় গেলাম।

জনাব কায়সার এমপিএ এবং ডাক্তার মান্নান এই দু'জন আওয়ামী লীগ কর্মীও সেখানে ছিলেন। আমরা স্থির করলাম যে, এখানে আলাপ-আলোচনা করা নিরাপদ নয়, তাই আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলাম। যাবার সময় আমরা খুব সতর্ক ছিলাম যে কেউ আমাদের অনুসরণ করছে কিনা।

আমরা আওয়ামী লীগ কর্মীদের তাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললেন যে, শেখ সাহেব রাজনৈতিক সমাধানের আশা করছেন। আমরা বললাম যে,

আমরা আপনাদের সাথে আছি। আপনাদের পক্ষ থেকে যদি ঠিক সময়ে কোনো সাড়া বা আভাস পাই তাহলে আমরা কিছু একটা করতে পারি।"

অন্যদিকে ইপি আর-এর এ্যাসিসট্যান্ট উইং কমাণ্ডার ক্যাপটেন হারুণ আহমদ চৌধুরী ওই ২২ মার্চের ঘটনা নিয়ে লিখেছেন এভাবে-

"২২শে মার্চ আমি চট্টগ্রামে আসলে ক্যাপ্টেন রফিক আমাকে বললেন, ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অনেক বাঙালি অফিসার আছেন, তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেশের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর এবং বিদ্রোহ সম্পর্কে কথাবার্তা চালাও। আমি কাপ্টেন রফিকের কথামত ২৩শে মার্চ ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেসে যাই এবং আমার কোর্সমেট ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী (বর্তমান লে. কর্ণেল) ক্যাপ্টেন অলি আহমদ (বর্তমান মেজর) এর সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলি। মেজর শওকত তখন মেসে ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি সিনিয়র, সেহেতু তাঁর সঙ্গে কথা বলতে সাহস পাইনি।

উপরে বর্ণিত তরুণ অফিসারবৃন্দকে নিয়ে আমি ক্যাপ্টেন রফিকের বাসায় সন্ধ্যায় আসি এবং সেখান থেকে ক্যাপ্টেন রফিক সহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অধ্যাপকের বাসায় পৌছাই-তখন রাত অনুমান সাড়ে নটা। আমার নিজের একটি ভক্সওয়াগন গাড়ি ছিল। ঐ গাড়িতে করে আমরা গিয়েছিলাম। ঐ সভাতে এমপিএ আতাউর রহমান খান কায়সার, ডাঃ মান্নানসহ আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। সভায় দেশের সর্বশেষ অবস্থা, আমাদের ক্ষমতা, পাকিস্তান থেকে সৈন্য নিয়ে আসা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়। সামরিক বাহিনীর গতিবিধি দেখে আমরা নিশ্চিত হলাম যে, পাকিস্তানি সেনারা সত্বর বাঙালিদের বিরুদ্ধে একটা কিছু করতে যাচ্ছে। সভায় ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তরুণ অফিসারবৃন্দের সঙ্গে আমাদের ইপিআর বাহিনীর অফিসারবৃন্দের (২ জন) মাঝে সমঝোতা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যদি পাক বাহিনী আক্রমণ করে আমরা বাঙালিরা একসঙ্গে প্রতিরোধ গড়বো এবং সমুচিত জবাব দেব।"

ক্যাপন্টেন হারুণ আহমদ চৌধুরী যখন নিবন্ধটি লেখেন তখন তাঁর র‍্যাঙ্ক ছিল ব্রিগেডিয়ার। তাঁর নিবন্ধটিও বাঙলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধঃ দলিলপত্র গ্রন্থের ৬০ থেকে ৬৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রয়েছে।

ক্যাপটেন হারুণ আহমদ সরাসরি মেজর জিয়ার সেনাইউনিটের কেউ ছিলেন না। তিনি ছিলেন আধা সামরিক বাহিনী ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্-এর সেনা অফিসার। অপরদিকে লে. শমসের মবিন চৌধুরী ছিলেন সরাসরি মেজর জিয়ার অধস্তন সেনা অফিসার। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হল লে. শমসের মবিন চৌধুরী বাঙলাদেশের স্বাধীনতা বা বিদ্রোহের ব্যাপারে কস্মিনকালেও মেজর জিয়ার সাথে আলাপ করেন

নি। তিনি দাবী করেছেন, বাঙলাদেশের স্বাধীনতা ও বিদ্রোহের ব্যাপারে সবসময় তিনি যোগাযোগ রেখেছেন আধা সামরিক বাহিনী ইপিআর-এর চট্টগ্রাম অঞ্চলের এ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপটেন রফিকের সাথে। এটা তাঁর লেখাতেই সুস্পষ্ট। গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন-

"২৩শে মার্চ মেজর রফিক আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে বললেন। কিন্তু কিছু একটা হবে কিনা তিনি এখনও জানেন না। আমাদের আলোচনার কথা মেজর জিয়াউর রহমানকে জানালাম। তাঁকে আমরা আবার আশ্বাস দিলাম যে, আমরা সবসময় তার সাথে থাকব।/এর আগে লে. মাহফুজকে পরিস্থিতি অবগত করানোর জন্য মেজর জিয়াউর রহমান আমাকে বলেছিলেন/ আমি তাকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললাম যে, আমাদেরকে পাকিস্তানিরা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখছে। আমরাও তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারছি না। মেজর জিয়াউর রহমান বলেছেন যে 'সিটিং ডাক' এর মত না থেকে নিরস্ত্র করতে আসলে তা প্রতিহত করবেন। মাহফুজ বলল যে, পরিস্থিতি এত মারাত্মক আকার ধারণ করেছে কিনা? তারপর সে বলল যে, আচ্ছা ঠিক আছে। ২৪ মার্চ মেজর রফিক আমাকে বলল যে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তাদের কোনো সিদ্ধান্ত এখনও আমাদেরকে জানান নি। ২৪শে মার্চ রাতে খবর পেলাম যে, জনগণ রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করছে। 'এমভি সোয়াত' থেকে অস্ত্রশস্ত্র খালাস করতে জনগণ বাধা দিচ্ছে। জেটি থেকে সেনানিবাস পর্যন্ত রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি হয়েছে যাতে সেনাবাহিনীর লোকজন চলাফেরা করতে না পারে। এ খবরটা আমি জিয়াউর রহমান সাহেবকে পাঠালাম।"

ওই একই নিবন্ধের অন্য আর এক জায়গায় লে. শমসের মবিন চৌধুরী লিখেছেন-

"২৫ মার্চ ব্রিগেডিয়ার আনসারী আমাদের সিও-কে নির্দেশ দিলেন, যেন আমরা ব্যারিকেড পরিষ্কার করি। 'অল ব্যারিকেড মাস্ট বি ক্লিয়ারড এ্যাট এনি কস্ট'- ব্রিগেডিয়ার আনসারীর ম্যাসেজ ছিল। 'এ্যাট এনি কস্ট' শব্দটার উপর আমাদের খুব এ্যামফ্যাসিস করছিলেন। ষোলশহর রেলক্রসিং এর উপর ওয়াগন দিয়ে ব্যারিকেড করা হয়েছিল। ঐ ব্যারিকেড সরাতে পুরো একটা কোম্পানী ডিটেইল করা হয়। সুবেদার খালেককে বললাম যে, এ ট্রেনের ওয়াগন যেন বিকেল চারটর আগে সরানো না হয়। কমাণ্ডিং অফিসার আমাদের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদেরকে ডেকে ঐ ওয়াগনগুলোর চাকার ব্রেক ভাঙতে শুরু করলেন। জনসাধারণ খুব হৈ-হুল্লোড় করছিল। বিকেল পর্যন্ত ঐ ব্যারিকেড সরানো হল। বায়েজীদ বোস্তামী পর্যন্ত ব্যারিকেড পরিষ্কার করতে নির্দেশ দেয়া হল। আমরা আশা করছিলাম যে, আওয়ামী লীগ হাই কমাণ্ড

থেকে কোনো নির্দেশ পাব। আমি মেজর রফিকের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করি। তিনি বললেন যে, কোনো নির্দেশ তিনিও পান নি। তিনিও প্রস্তুত আছেন।

লে. শমসের মবিনের উপরের বক্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, মেজর জিয়া বা লে. কর্ণেল এম. আর. চৌধুরী নয়, চট্টগ্রামে ওসময় বাঙালি সেনাপতিদের মধ্যে ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামই ছিলেন বিদ্রোহ ও বিপ্লবী চিন্তা ধারার মূল প্রবক্তা। সব কিছু তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। সকলে তার সাথেই যোগাযোগ রাখতেন। তার পরামর্শেই চলতেন। **অথচ ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! কিছু না করেও মেজর জিয়া ক্যাপ্টেন রফিকের সকল কৃতিত্ব ছিনতাই করে নিজের থলেতে ভর্তি করেছেন অবলীলায়।**
এখানে আরও একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, লে. শমসের মবিন চৌধুরী ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরই শুধু মেজর জিয়াকে তা অবহিত করতেন বলে দাবী করেছেন। ঘটনা ঘটবার আগে নয়। ব্যাপারটি দস্তুরমত গবেষণার বিষয়।
এটি এ ধারণা নিশ্চিত করে যে, **মেজর জিয়া সে সময়ের প্রকৃত ঘটনা সত্যিকার অর্থে কিছুই জানতেন না। জুনিয়র অফিসার বা অন্যদের নিকট শুনে শুনেই হিসেব মেলাতেন।** যার ফলে তিনি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা (?) বর্ণনা করতে গিয়ে সঠিক তথ্য ও সঠিক অবস্থা বর্ণনা করতে কিছুতেই পারেন নি। পদে পদে শুধু ভুলের ও মিথ্যার জগাখিচুরি বানিয়ে ছেড়েছেন। অথবা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত ও কলংকিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে ভুল ও গোজামিলে ভরা ইতিহাস লিখেছেন।
যেমন তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারের এক জায়গায় দাবী করেছেন যে, ২১ মার্চ চট্টগ্রাম সেনানিবাসে এক ভোজসভায় পাকিস্তানের এক জেনারেলের মুখে বাঙালিদের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যাবার নির্দেশ দিতে তিনি শুনেছেন। অথচ ইতিহাস সাক্ষি দিচ্ছে যে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ চট্টগ্রাম সেনানিবাসে পাকিস্তানের কোনও জেনারেল আসেন নি এবং কোনও ভোজসভার আয়োজনও হয় নি। এ ব্যাপারে আগে আমরা মেজর জিয়ার দাবীটি দেখি। তারপর দাবীটি যে কল্পনাপ্রসূত তা প্রমাণে অন্যরা কে কী বলেছেন দেখব। তিনি লিখেছেন-

বাঙলাদেশের উপর বর্বর হামলার প্রস্তুতি দেখতে এলেন পাক সেনাবাহিনীর হামিদ খান। ২১শে মার্চ চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে তাকে আপ্যায়িত করা হলো ভোজে। এই মধ্যাহ্ন ভোজেই পশ্চিমা সামরিক অফিসারদের কানাঘুষা আর হামিদের একটি ছোট্ট উক্তিতে বাঙালি অফিসাররা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন সময় ঘনিয়ে এসেছে। হামলা অত্যাসন্ন।
মধ্যাহ্ন ভোজে জেনারেল হামিদ বাঙালি অফিসারদের যেন চিনতেই পারছিলেন না।

তাঁর যত কানা ঘুষা আর কথাবার্তা চলছিলো পশ্চিমা অফিসারদের সাথে।
কি এত কানাঘুষা? কিসের এত ফিসফাস? সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলো মেজর জিয়ার মন। কৌশলে একজনের সাথে কথা বলতে বলতে গিয়ে দাঁড়ালেন জেনারেল হামিদের ঠিক পেছনে। দাঁড়ালেন পেছন ফিরে। কথা বলতে লাগলেন সঙ্গীটির সাথে আর দু'কান সজাগ রাখলেন জেনারেল হামিদের কথার দিকে।
জেনারেল হামিদ তখন কথা বলছিলেন ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্ণেল ফাতমীর সাথে। অনেক কথার মধ্যে অনেকটা যেন সামরিক নির্দেশের মতই কর্নেল ফাতমীকে বলে উঠলেন জেনারেল হামিদ দেখ-ফাতমী, অভিযান (এ্যাকশন) খুব দ্রুত ও কম সময়ের মধ্যে হতে হবে। আমাদের পক্ষে কেউ যেন হতাহত না হয়।
বিস্ময়কর ব্যাপার হল চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ২১ মার্চ কোনও পাকিস্তানি জেনারেল আসেন নি। সেনানিবাসের রেকর্ড বলছে ২১ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোনও উচ্চপদস্থ জেনারেল চট্টগ্রাম সেনানিবাস সফর করেন নি। এটি মেজর জিয়ার কল্পনাপ্রসূত এক আজগুবী দাবী। এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ইবিআরসি'র সেনা অফিসার এবং আগত অফিসারদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ক্যাপটেন এনামুল হক চৌধুরী যে বক্তব্য প্রদান করেছেন তা এখানে তুলে ধরছি। ক্যাপটেন এনামুল হক চৌধুরীর এ উদ্ধৃতিটি বাঙলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র গ্রন্থের ৯ম খণ্ডে ছাপানো তাঁর নিবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে। নিবন্ধটির নাম "ঈস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের ঘটনা ও প্রতিরোধ" এটি ৪৫ পৃষ্ঠা থেকে ৫৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থিত হয়েছে।
ক্যাপটেন এনাম দাবী করেছেন এভাবে-

২১শে মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ইবিআরসি'র বাঙালি অফিসারদেরকে ডেকে চট্টগ্রাম শহরকে পুরো নিয়ন্ত্রণে আনা এবং বাঙালিদের যেন অযথা হয়রানি, দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দিলেন। তদানুসারে আমরা সমস্ত অফিসার সৈন্যদের নিয়ে শহরে যাই। আমি নিজে অয়ারলেস কলোনীতে যাই। সেখানে ক্যাপ্টেন রফিকের (এ্যাডজুট্যান্ট, ইপিআর) সাথে দেখা হয়ে যায়। তাঁর সাথে চট্টগ্রামের ডিসি এবং এসপিও ছিলেন। রাত আটটার দিকে অয়ারলেস কলোনীতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। বহু কষ্টে ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্ট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তার জন্য ডিসি, এসপি খুব আনন্দিত হন এবং বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা থাকলে পরিস্থিতি আরও মারাত্মক আকার ধারণ করত।
ক্যাপটেন এনামের মতে ২১ মার্চ ইবিআরসি'র সব বাঙালি অফিসার স্টেশনের বাইরে

ছিলেন। সুতরাং চীফ অব জেনারেল স্টাফ, লে. জেনারেল হামিদ খানের মত সর্বোচ্চ পর্যায়ের একজন জেনারেলের সফরের সময় সব অফিসার স্টেশনের বাইরে থাকতে পারে না। তাহলে কি জেনারেল হামিদ চট্টগ্রাম সেনানিবাস পরিদর্শনে কখনও আসেন নি? হ্যাঁ, তিনি এসেছিলেন। মেজর জেনারেল নওয়াজেশ আলী খান, মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ও ব্রিগেডিয়ার এম.এইচ আনসারীকে সঙ্গে নিয়ে জেনারেল হামিদ খান চট্টগ্রাম সেনানিবাস পরিদর্শনে এসেছিলেন। তবে সেটা ২১ মার্চ নয়। সেটা ছিল ২৪ মার্চ বুধবার। ইবিআরসি'র লগবুকে এরকমই লেখা আছে। তদুপরি জেনারেলদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য নিয়োজিত সেনাঅফিসার ক্যাপটেন এনাম ও ৮ম বেঙ্গলের জুনিয়র সেনাঅফিসার লে. শমসের মবিনও তাই দাবী করেছেন। সিওএস জেনারেল হামিদ খানের চট্টগ্রাম সেনানিবাস পরিদর্শন সম্পর্কে ক্যাপটেন এনামের দাবী।

"২৪শে মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার, কর্ণেল হামিদ হোসেন শিগরী, ক্যাপ্টেন মোহসিন (এডজুট্যান্ট) চট্টগ্রাম বন্দরে এম.ভি. সোয়াত জাহাজের অস্ত্রশস্ত্র–গোলাবারুদ খালাসের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য এক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে যোগ দিতে চলে যান। আমাকে নির্দেশ দিয়ে যান ব্রিগেডিয়ার আনসারী হেলিকপ্টার যোগে ঢাকা থেকে আসার পর তাঁকে জীপ যোগে চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠিয়ে দিতে।

হেলিকপ্টার যখন চট্টগ্রাম সেনানিবাসে অবতরণ করে তখন আশ্চর্যের সাথে দেখতে পাই লে. জেনারেল হামিদ খান (সিওএস, পাকিস্তান আর্মি), জেনারেল নওয়াজেশ, জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা (জিওসি, ১৪ ডিভিশন, ঢাকা) এবং ব্রিগেডিয়ার আনসারী এরা সবাই হেলিকপ্টারে ঢাকা থেকে এসেছেন। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার আনসারী সেই হেলিকপ্টারে চট্টগ্রাম বন্দরে চলে যান। তাদেরকে দেখার সাথে সাথে আমরা সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম। কারণ, তাদের আগমন অপ্রত্যাশিত ছিল।

জেনারেলদের আগমনের সাথে সাথে ২০ বেলুচের সিও লে. কর্ণেল ফাতমী ইবিআরসি-তে আসেন। চা পানের পর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা ২০ বেলুচের সিও'র সাথে ২০ বেলুচ অফিসে চলে যান। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি যে, স্টারপ্লেট ছাড়াই তিনি গাড়িতে করে ছদ্মবেশে ২০ বেলুচের অফিসে চলে যান। ইবিআরসি অফিসার মেস এ আমরা লাঞ্চ পার্টির আয়োজন করি। সেখানে প্রায় ৩০/৪০ জন অফিসার উপস্থিত ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও ব্রিগেডিয়ার আনসারীর জন্য আমরা প্রায় ১ ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার তিনটার সময় পোর্ট থেকে আমাকে টেলিফোনে পার্টি শুরু করার নির্দেশ দিলেন।

পাঠক লক্ষ্য করুন– মেজর জিয়া ২১ মার্চের ভোজসভার দাবীতে উল্লেখ করেছেন

যে, ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সিও কর্ণেল ফাতমীকে লে.জে. হামিদ খান অভিযান খুব দ্রুত ও কম সময়ের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দিতে তিনি শুনেছেন।

মেজর জিয়ার এ দাবীর মধ্যে যে সত্যের লেশমাত্রও নেই সেটা ক্যাপটেন এনামের বর্ণনাতে সুস্পষ্ট হয়েছে। মেজর জিয়ার এ মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে আরও একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য আমরা এখানে উপস্থিত করছি। তাঁর নাম মেজর সিদ্দিক সালিক। মেজর সালিক ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জনসংযোগ অফিসার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। নিচের উদ্ধৃতিটি তার লেখা "উইটনেস টু সারেণ্ডার" গ্রন্থ থেকে নেয়া। তার দাবীতে-অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে কীভাবে অপারেশন সার্চলাইট-এর নির্দেশনা হস্তান্তরিত হয়েছে তাই-ই শুধু স্পষ্ট হয় নি; সাথে ২৪ মার্চই যে পাকিস্তানি জেনারেলরা চট্টগ্রামে এসেছিলেন তা প্রমাণ করেছে। মেজর সালিকের দাবী-

২৪শে মার্চ আওয়ামী লীগ একটি নতুন প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এলো... পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা যখন পিআইএ-ফ্লাইট ধরায় ব্যস্ত সে সময় জেনারেল ফরমান ও জেনারেল খাদিম দু'জনে দু'টি হেলিকপ্টারে উঠলেন। ব্রিগেড কমাণ্ডারদের (ঢাকার বাইরে অবস্থানরত) কাছে নির্দেশ পৌছে দেয়ার জন্যে। নির্দেশটি ছিল, সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হওয়া (তখনো পর্যন্ত 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিকল্পনাটি প্রকাশ করা হয় নি তবে অনুমোদিত হয়েছিল)। তাঁরা যথাক্রমে ব্রিগেডিয়ার দুররানী (যশোর) ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফিকে (কুমিল্লা) পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। ফরমান ঢাকায় ফিরে এলেন। আর খাদিম কুমিল্লা থেকে গেলেন চট্টগ্রামে। চট্টগ্রাম ছিল প্রতারণামূলক স্থান। সেখানকার একমাত্র সিনিয়র অফিসার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদার। আওয়ামী লীগের সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে বলে সবাই জানতো। অত্যন্ত নিপুণভাবে জিওসি পরিস্থিতি সামলান। সবচেয়ে সিনিয়র অবাঙালি অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ফাতেমীর কাছে গোপনে নির্দেশটি পাচার করে দেন। কুমিল্লা থেকে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি পৌছানো পর্যন্ত তাঁকে শক্ত করে মাটি কামড়ে বসে থাকতে বললেন। অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে বোঝালেন যে, জয়দেবপুরে (ঢাকার উত্তরে) অবস্থানরত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের মধ্যে অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে তাদের শান্ত করার জন্যে 'ব্যাঘ্রপিতা'কে সেখানে একবার উঁকি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাদের সঙ্গে তাঁর কথা বলতে হবে। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার রাজী হলেন। তাঁকে ঢাকায় আনা হলো। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মজুমদারের আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটলো।

মেজর সিদ্দিক সালিকের বর্ণনায় সুস্পষ্ট হয়েছে যে, গোপনীয় অপারেশন "সার্চলাইট"

পরিকল্পনা গোপনভাবেই কর্ণেল ফাতেমীর হাতে পৌঁছেছে। সেখানে ফিস ফিস করে বলার কোনও অবকাশই ছিলনা। বিশেষ করে 'সার্চলাইট' অপারেশনের নির্দেশটি কর্ণেল ফাতেমীকে হস্তান্তর করেছিলেন ১৪তম ডিভিশনের কমাণ্ডার মে. জে. খাদিম হোসেন রাজা। সেখানে লে. জে. হামিদ খানের কোনও ভূমিকা রাখার তিল পরিমাণও অবকাশ ছিল না। আগেই বলেছি ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম সেনানিবাসে পাকিস্তানের উচ্চ পর্যায়ের জেনারেলদের ব্যাপারে ৮ম বেঙ্গলের লে. শমসের মবিনও দাবী করেছেন তার লেখায়। তিনি লিখেছেন-

"২৪শে মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুইজন মেজর জেনারেল চট্টগ্রামে ইবিআরসি-তে এসেছিলেন। ঐ দিন জানতে পারলাম দু'জনের সাথে করে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে (ইবিআরসি কমাণ্ডার, মার্শাল ল' এডমিনিসট্রেটর) ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ খবরটা জিয়াউর রহমানকে জানাই। আমাদের সিও লে. কর্ণেল জানজুয়া বললেন, যে, ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয় নি। তিনি বার বার বলছিলেন যে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে নিয়ে যাওয়া হয় নি। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের জায়গায় ব্রিগেডিয়ার আনসারীকে সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়।"

লে. শমসের মবিন চৌধুরীর দাবীতে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, চট্টগ্রাম সেনানিবাসে পাকিস্তানি জেনারেলদের আগমনের খবরটি তিনিই মেজর জিয়াকে জানিয়েছেন। এর অর্থ কী দাঁড়ায়? মেজর জিয়ার অনেক জুনিয়র একজন অফিসার তাঁকে জানাচ্ছেন যে ইবিআরসিতে দু'জন পাকিস্তানি জেনারেল এসেছিলেন। মেজর জিয়া কি তাহলে ওই খবর জানতেন না? অবশ্য না জানারই কথা। কারণ, ওই জেনারেলদের সফর ছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত। খুব গোপনেই তাঁরা এসেছিলেন অপারেশন সার্চলাইট"-এর গোপন নির্দেশ হস্তান্তরের জন্য। সেটা মেজর সিদ্দিক সালিকের বর্ণনাতেই সুস্পষ্ট। ক্যাপটেন এনামও বলেছেন চীফ অব স্টাফকে দেখে তাঁরা বিস্মিত হয়েছেন। সুতরাং মেজর জিয়া ইবিআরসি থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে ৮ম বেঙ্গলে বসে সে খবর কীভাবে পাবেন? এবং সেটাই দিনের আলোর মত সত্য। আর বাকী সবই মিথ্যার মহাকাব্য। এটা বাঙালি সেনাবাহিনীকে বিশ্বের দরবারে অপদস্থ করার অপপ্রয়াস হিসেবে গণ্য হবার দাবীদার।

মেজর জিয়ার মিথ্যার মহাকাব্যের ষোলকলা পূর্ণ হয়, যখন মেজর জিয়া দাবী করেন যে, ওই ভোজসভার পরপর সেদিনই সস্ত্রীক মেজর জিয়া চট্টগ্রামের এরিয়া কমাণ্ডার ও মার্শাল'ল এডমিনিসস্ট্রেট'র ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন উল্লেখ করায়। শুধু তা নয়, মেজর জিয়া তাঁর চাইতে অনেক সিনিয়র এবং পুরো ডিভিশনের কমাণ্ডার সম্পর্কে এমন মন্তব্য করেছেন যে, তা পড়ে দস্তরমত হতভম্ব হতে হয়। মেজর জিয়া বলতে চেয়েছেন, পাকিস্তানি জেনারেলরা যে সেনানিবাসে

এসেছিলেন, সে সেনানিবাসের মূল কমাণ্ডারই সে সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। অর্থাৎ ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের তা জানার বাইরে ছিল। শুধু মেজর জিয়া নিজেই তা জানতেন। এ ব্যাপারে মেজর জিয়ার দাবীটি পাঠক লক্ষ্য করুন। তিনি বলেছেন-

ওই দিনই বিকেলে তিনি সস্ত্রীক এক সৌজন্য সাক্ষাতে গেলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের বাসায়। কথায় কথায় তিনি জানতে চাইলেন জেনারেল হামিদের সফরের উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সে তথ্য ছিল অজানা। তিনি শুধু বললেন, ওরা আমাকে বিশ্বাস করে না। তিনি জানালেন, জেনারেল হামিদ যখন অপারেশন রুমে ছিলেন তখন তাঁকে সে ঘরে ঢুকতেই দেয়া হয় নি।

ওই দিনই বিকেলে সস্ত্রীক ব্রিগেডিয়ারের বাসায় মেজর জিয়ার বেড়াতে যাবার দাবীর মধ্যে দিয়ে আরও একটি বিরাট সত্য বেরিয়ে এসেছে। আমরা জানি ২৪ মার্চ বিকেল সাড়ে চারটা- পাঁচটার দিকে ইবিআরসি'তে অনুষ্ঠিত ভোজসভার পরপরই চট্টগ্রামের "ব্যাঘ্রপিতা" ব্রিগেডিয়ার, মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে জেনারেল হামিদ, জেনারেল নওয়াজিশ, জেনারেল খাদিম হোসেন হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় চলে যান। এর আগে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার বিকেল পৌনে চারটায় চট্টগ্রাম পোর্ট থেকে এসে ভোজসভায় যোগ দেন। ক্যাপটেন এনাম দাবী করেছেন, ভোজসভায় খাওয়া দাওয়া সেরেই ব্রিগেডিয়ার মজুমদার অন্যাদের সাথে ঢাকা চলে যান। তাহলে ওইদিনই বিকেলে অর্থাৎ ২৪ মার্চ বিকেলে মেজর জিয়া সস্ত্রীক ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলেন কীভাবে? আর গিয়েই যদি থাকেন, তাহলে কোথায় গেলেন? ব্রিগেডিয়ারতো বাসায় যাবার সুযোগই পান নি। তাহলে?

এবার আমরা ক্যাপটেন এনামুল হক চৌধুরীর বক্তব্যটি দেখি। তিনি লিখেছেন-

ব্রিগেডিয়ার মজুমদার বেলা পৌনে চারটার দিকে হেলিকপ্টার যোগে ব্রিগেডিয়ার আনসারী, ক্যাপ্টেন মোহসিনসহ ইবিআরসি-তে আসেন। খাওয়া শেষ করার পর ব্রিগেডিয়ার মজুমদার আমাকে বললেন যে, বিশেষ কারণে তিনি ঢাকা চলে যাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, 'লুক আফটার ইওরসেলফ।'

তার সাথে ক্যাপ্টেন আমিন আহমদ চৌধুরী (এআরওপি) মেডিক্যাল চেকআপ এর জন্য ঢাকা আসেন। সব জেনারেল একই হেলিকপ্টারে ঢাকা রওয়ানা হয়ে যান।

পাঁচ

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি – ২৪ মার্চ পাকিস্তান আর্মির সিওএস, লে.জে. হামিদ খান, মে.জে. নোয়াজিস খান, মে.জে. খাদিম হোসেন রাজা প্রমুখ চট্টগ্রামের সেনাসদরে এসেছিলেন এবং সেদিনই যাবার সময় ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও ক্যাপটেন আমিন আহমদকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় চলে যান। ২৪ মার্চ সম্পর্কে লে. শমসের মবিন চৌধুরী ক্যাপটেন এনামুল হক চৌধুরী ও মেজর সিদ্দিক সালিক আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন। কোনওই সন্দেহ নেই যে, ২৪ তারিখই ওই ঘটনা ঘটেছে। যদি তাই নয়, তাহলে মেজর জিয়া সেই একই ঘটনা নিয়ে একই সাক্ষাৎকারে আবার অন্যরকম ঘটনা বর্ণনা কীভাবে করেন! যেমন তিনি গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন এভাবে-

২৫শে মার্চে ব্যাপক রদবদল ঘটে গেল ক্যান্টনমেন্টের প্রশাসন ব্যবস্থায়। ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে উড়ে এলেন জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা, জেনারেল আনসারী, মেজর জেনারেল মিঠা খান, লে. জেনারেল খোদাদান খান প্রমুখ। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে তাঁরা জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন ঢাকায়। সেই সাথে নিয়ে গেলেন মেজর আমিন আহমদ চৌধুরীকেও। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের স্থানে আনসারী নিযুক্ত হলেন স্টেশন কমাণ্ডার। কর্ণেল শিগারী দায়িত্ব নেন ইপিআর এর সেক্টর কমাণ্ডার হিসেবে।

উপরের বর্ণনা পড়ে মেজর জিয়ার বুদ্ধি, বিবেচনা ও মেধা সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ জাগে। ২৪ মার্চ ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা নিয়ে তিনি যেভাবে তারিখ নিয়ে বিভ্রাট সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন, তা দেখে আমাদের মনে সেই সন্দেহই জেগেছে।

২৫ মার্চ নিয়ে তিনি যে শুধু ২৪ তারিখের ঘটনাকেই উল্টে - পাল্টে দেন নি, সাথে সেনানিবাসে আসা জেনারেলদের ব্যাপারেও ভুল ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দিয়েছেন। আমরা জানি ২৪ মার্চ ঢাকা থেকে যারা এসেছিলেন সেখানে মেজর জেনারেল মিঠা খান ও লে. জেনারেল খোদাদাদ খান নামে কোনও সেনাপতি ছিলেন না এবং আমরা যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী সম্পর্কে কম বেশি ওয়াকিবহাল, তারা জানি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে জেনারেল মিঠা খান নামে কখনও কোনও সেনাপতি ছিলেন না। তবে জেনারেল এ.ও. মিঠঠ নামে একজন সেনাপতি ছিলেন, যিনি পদাধিকার বলে ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল (কিউএমজি)

আমি মেজর জিয়ার মেধার উপর প্রশ্ন তুলেছি সম্পূর্ণ একটি অন্য কারণে। মেজর জিয়া যখন ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম দিকে দৈনিক বাংলা'য় প্রকাশের জন্য এই সাক্ষাৎকারটি দিচ্ছিলেন, তখন তিনি মাত্র এক বছর আগে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে সংঘঠিত তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় ঘটনা সমূহের সময়, দিন ও তারিখ

নিয়ে এত বিভ্রান্ত হয়েছিলেন কেন? এরদ্বারা কী প্রমাণিত হয়? কোনও মেধাবী মানুষ কি মাত্র এক বছরের মাথায় এমন ভুল ভ্রান্তি করতে পারেন? এর থেকে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা না থাকার প্রশ্নও কি জোড়ালো হল না?

এছাড়াও মেজর জিয়া ২৫ মার্চ তার কার্যকলাপের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে আরও এমন বহু তথ্য উপস্থাপন করেছেন যা সময়ের সাথে এবং অন্যদের মতের সাথে মেলে না। মেজর জিয়ার এই বিভ্রান্তিমূলক সময় ও তথ্য উপস্থাপনের ব্যাপার দেখে আমাদের মনে আবার সেই সন্দেহ দানা বাঁধছে যে, সত্যিই তিনি মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অর্জনসমূহকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে ধ্বংস করতেই চেয়েছিলেন কি না? আমার বিশ্বাস, তিনি তাই চেয়েছিলেন যেমন তিনি গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় দাবী করেছেন যে, **রাত এগারটায় অফিসার কমাণ্ডিং জানজুয়া আকস্মিকভাবে মেজর জিয়ার কাছে নির্দেশ পাঠালেন এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে বন্দরে যাবার জন্যে। এই আকস্মিক ও রহস্যজনক নির্দেশের অর্থ তাঁর কাছে বোধগম্য হলো না। রাত প্রায় সাড়ে এগারটায় জানজুয়া নিজে এসে তাঁকে নৌবাহিনীর একটি ট্রাকে তুলে ষোলশহর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বন্দরের দিকে রওনা করে দেন।**

আবার সেই একই প্রসঙ্গে ৮ম বেঙ্গলের লে. শমসের মবিনের বক্তব্য নিম্নরূপ। তিনি লিখেছেন-

'রাত সাড়ে এগারটায় লে. কর্ণেল জানজুয়ার সাথে দেখা হয়। তিনি আমাকে মেজর জিয়াউর রহমানকে চট্টগ্রাম পোর্ট-এ ডিউটি করতে খবর দিতে বললেন। তিনি জিয়াউর রহমানের স্ত্রীকে বলতে বললেন যে, ভয়ের কোনো কারণ নেই। জিয়াউর রহমান ২৬শে মার্চ সকালে চলে আসবে। রাস্তায় ছেলেরা একটা গর্ত করেছিল। সেই গর্তটা ভরাট করতে আমাকে বলা হল। আমি জিয়াউর রহমানের স্ত্রীকে এ খবর বললাম। জিয়াউর রহমানকেও এ খবর জানালাম।'

মেজর জিয়া দাবী করেছেন ৮ম বেঙ্গলের কমাণ্ডিং অফিসার লে. কর্ণেল আবদুর রশিদ জানজুয়া এসে তাঁকে নৌবাহিনীর ট্রাকে তুলে দিয়েছিলেন বন্দরে গিয়ে সোয়াত থেকে অস্ত্র খালাসের তদারকি করার জন্য।

অন্যদিকে ৮ম বেঙ্গলের জেসিও লে. শমসের মবিন চৌধুরী বলছেন অন্য কথা। রাত সাড়ে ১১টায় সিওএর নির্দেশ নিয়ে লে. শমসের মবিন চৌধুরী ষোলশহর দু'নম্বর গেইট থেকে নতুনপাড়া সেনানিবাসের অফিসার কোয়ার্টারে অবস্থানরত মেজর জিয়া ও তাঁর স্ত্রীকে সংবাদটা পৌঁছে দিয়েছেলেন। মনে রাখতে হবে ষোলশহর ২নং গেইট থেকে নতুনপাড়া সেনানিবাস অফিসার কোয়ার্টার কমপক্ষে সাড়ে তিন থেকে চার কিলোমিটার দূরে। এই দূরত্ব অতিক্রম করে মেজর জিয়ার কাছে খবরটি পৌঁছাতে রাত কয়টা বেজেছিল সেটা আমাদের জানা নেই। লে. শমসের মবিনও আমাদেরকে

তা জানান নি। এখন আমরা এই দু'জনের কার কথা বিশ্বাস করব?
আবার এই রাত সাড়ে ১১টা সম্পর্কে ৮ম বেঙ্গলে মেজর জিয়ার সতীর্থ মেজর মীর শওকত আলী কী মন্তব্য করছেন পাঠক তা লক্ষ্য করুন। তিনি বলেছেন-
"রাত প্রায় ১১-৩০ মিনিটের সময়ে আমরা টেলিফোনে জানতে পারলাম যে ঢাকায় হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছে। স্বভাবতই আমরা ধরে নিলাম ঢাকায় যখন হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে, নিশ্চয় এটা বাঙলাদেশব্যাপী শুরু হয়ে গিয়েছে। কারণ সেনাবাহিনীতে মাত্র এক জায়গায় তাদের পরিকল্পনা কার্যকর করে না; এ জাতীয় পরিকল্পনা সব জায়গাতেই একই সময় কার্যকর করাই স্বাভাবিক। আমাদের কর্তব্য আমরা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। কারণ ২৫ মার্চের আগে থেকেই আন্দোলনের যে রূপ নিচ্ছিল, সে সবে যখনই আমাদের নিযুক্ত করা হতো ব্যারিকেড সরানোর জন্য কিংবা জনগণকে হটানোর জন্য, আমরা তাদের বিরুদ্ধে কাজ কখনো ঠিকমত করতাম না। কার্যতঃ আমরা সেই চূড়ান্ত অসহযোগের সময় থেকেই আন্দোলনের প্রতি আমাদের সমর্থন জানাতে শুরু করি। কাজেই ২৫শে মার্চ '৭১ রাতে যখন হানাদার বাহিনী বাঙালি হত্যাকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন আমাদেরও তাৎক্ষণিকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া বাদে অন্য কোনো বিকল্প ছিল না।
বাঙালি হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার খবর দিয়ে সম্ভবত আমাদের কাছে প্রথম টেলিফোন করেছিলেন চট্টগ্রামের হান্নান ভাই (চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি) সম্ভবত তিনিই চট্টগ্রামে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।" [একাত্তরের রণাঙ্গন পৃষ্ঠা ১৬৬-৬৭।]
এখন পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, রাত ১১.৩০ মিনিটে বাঙালি হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়ার সাথে সাথে মেজর শওকত আলী মেজর জিয়া ও ৮ম বেঙ্গলের কোয়ার্টার মাস্টার ক্যাপটেন অলি আহমদ বা ক্যাপেটেন খালেকুজ্জামান বা লে. শমসের মবিন বা লে. মাহফুজকে জানিয়েছিলেন কিনা?
যদি তিনি জানিয়ে থাকেন তাহলে ঠিক ওই সময় মেজর জিয়া সেই একই জায়গা ৮ম বেঙ্গলের স্টেশন হেড্ কোয়ার্টার থেকে বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন কীভাবে? অথবা লে. শমসের মবিন ওই একই জায়গা থেকে নতুনপাড়া সেনানিবাসের দিকে মেজর জিয়া ও বেগম জিয়াকে সিও'এর নির্দেশ জানানোর জন্য যাত্রা করেন কীভাবে?
মেজর জিয়ার অধস্থন সেনা অফিসার ৮ম বেঙ্গলের জেসিও লে. মাহফুজুর রহমানও ওই রাত ১১টা সাড়ে ১১টার ব্যাপারে বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁর সেই বিবৃতি বাঙলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র গ্রন্থের ৯ম খণ্ডের ৭০ থেকে ৭৬ পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। যেখানে তিনি বলেছেন- "I myself with Lt. (now Captain) Shamsher Mobin Chowdhury were detailed in the evening with a

company to guard the Sholashahar Cantonment road by night so that no more barricades were put there. 2/ Lt. Mohammed Humayun (pak offr.) was also with me. Sometime at 11 o'clock night, while having rest with the company at K-Rahuman's COCACOLA factory. I received a telephone call from the city. An unknown person in a panic and hurry was trying to pass an important message to some of his relative in the factory and asked my identity. I was on duty here, I replied. The man thought me as one of the police guard there in the factory and said-we have received a telephone call now from Dhaka that firing has started there. Pakistanis have started killing the public enemy mass and all are trying to face them. I thanked the unknown man for giving me such an information in telephone and dropped the receiver.
As we approached a little towards our unit at Sholashahar I found Subedar Sabed Ali Shirkar rushing towards me and whisperes in bengali to reach the unit line immediately. I understood the rest, rushed with my troops at Sholashahar and found major (now Brig.) Ziaur Rahman getting all of our troops closed together in the line.
লে. মাহফুজের এ বিবৃতি পাঠকের বিভ্রান্তি বাড়িয়ে দেবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ, লে. মাহফুজ দাবী করেছেন- লে. শমসের মবিন চৌধুরী রাত ১১টায় তার সাথে ডিউটি করছিল নাসিরাবাদ শিল্প এলাকায়। সেখানেই লে. মাহফুজ জানতে পারেন যে, ঢাকায় অপারেশন সার্চলাইটের ক্র্যাক ডাউন শুরু হয়েছে। লে. মাহফুজের এই দাবী যদি সত্যি হয় তাহলে লে. শমসের মবিন চৌধুরী ৮ম বেঙ্গলের স্টেশন হেড কোয়ার্টার থেকে নতুনপাড়া সেনানিবাসে যাত্রা করে কীভাবে? তাও রাত সাড়ে ১১টায়?
রাত সাড়ে ১১টা সম্পর্কে ইপিআর এ্যাডজুন্ট্যান্ট ক্যাপটেন রফিকুল ইসলাম, ইবিআরসি'র ক্যাপটেন এনামুল হক চৌধুরী, ৮ম বেঙ্গলের কোয়ার্টার মাস্টার ক্যাপটেন অলি আহমদ প্রমুখ সেনাপতির নিজস্ব মতামত রয়েছে। এখন আমরা পর্যায়ক্রমে সেসব পাঠকের সামনে উপস্থিত করছি।
ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম বলেছেন, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এম.এ কাদেরকে দিয়ে ৮ম বেঙ্গলে তিনি যে সংবাদ পাঠান সেটাও ছিল রাত সাড়ে এগারটা।
আবার ক্যাপ্টেন এনামুল হক চৌধুরী বলেছেন- 'রাত সাড়ে এগারটার দিকে ৮ম বেঙ্গল থেকে মেজর মীর শওকত আলী টেলিফোনে বললেন, ইবিআরসি'র যত গাড়ি

আছে সবগুলোই যেন তাদের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। কারণ তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 'এমভি-সোয়াত' থেকে অস্ত্র আনলোড করতে। কিছুক্ষণ পর তিনি টেলিফোনে বললেন, তাঁর অধীনস্থ সকলে গাড়ির জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

আমি বললাম, 'গাড়ির জন্য খবর দেয়া হয়েছে'। দু-তিন মিনিট পর তিনি আবার টেলিফোনে বললেন, ব্রিগেডিয়ার আনসারী তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। যদি পাঠাতে আমি দেরি করি তাহলে আমার অসুবিধা হবে।'

ক্যাপ্টেন এনামের এই বক্তব্যটি রাত সাড়ে এগারটার প্রশ্নতো বটেই, সাথে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যবাহিনী ও তার সেনাপতিদের ব্যাপারেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছে। ক্যাপ্টেন এনামের কাছে গাড়ি-ঘোড়া চেয়ে মীর শওকতের টেলিফোন করার কথা যদি সঠিক হয়, তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, মেজর শওকতের রাত সাড়ে এগারটায় হান্নান ভাই-এর নিকট থেকে পাকিস্তানিদের আক্রমণের সংবাদ পাওয়ার দাবী সর্বৈব মিথ্যা।

ক্যাপ্টেন এনামের এই রাত সাড়ে এগারটার সময়কাল ও বন্দরে অস্ত্র খালাশের জন্য সৈন্যবাহী গাড়ি পাঠাবার মীর শওকতের টেলিফোনের ব্যাপারটি, মেজর জিয়ার সাড়ে এগারটার কর্ণেল জানজুয়া কর্তৃক জোর করে নৌবাহিনীর ট্রাকে তুলে দেবার দাবীটিকেও, সন্দিহান করে তোলে। তাহলে কি আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, বন্দরে অস্ত্র খালাশ করবার জন্য একদিকে কর্ণেল জানজুয়া পাঠাচ্ছেন মেজর জিয়াকে, অন্যদিকে মেজর শওকতকে পাঠাচ্ছেন ডিভিশন কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার এম. এইচ আনসারী? সেনাবাহিনীর নিয়ম কানুনে এমনতর গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজে, একই সময়ে, একই রেজিমেন্টের দু'জন সেনানায়ক কি দু'দিক থেকে দু'ভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে পারে? দু'টি ঘটনা কি একই সময়ে সম্ভব? এ সূত্রে লে. শমসের মবিনের বর্ণনাটিও ধর্তব্যে আনতে হবে। তিনিও বলেছেন, রাত সাড়ে এগারটায় কর্ণেল জানজুয়ার নির্দেশটি তিনি চট্টগ্রাম সেনানিবাসে অবস্থিত মেজর জিয়ার বাসায় পৌঁছে দিয়েছিলেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ সময় সম্পর্কে মেজর জিয়ার সবচেয়ে প্রিয় ও বিশ্বস্থ সহযোদ্ধা ক্যাপটেন অলি আহমদের দাবীটি খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর জীবনীগ্রন্থ **'কর্ণেল অলি আহমদ বীর বিক্রমঃ জীবনের শেষ নেই'** নামক গ্রন্থের ১৯৭ পৃষ্ঠায় দাবী করেছেন এভাবে-

'২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকসেনারা দেশের নিরস্ত্র মানুষের উপর হামলা করল। দখল করল তৎকালীন ইপিআর হেড কোয়ার্টার। পুলিশ বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করল।

জাতির এই চরম মুহূর্তে ও বিপদের সময় ৩৫ বছর বয়স্ক তৎকালীন মেজর জিয়াউর

রহমান আমাদের কয়েকজন এবং ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের মাত্র তিনশ অন্যান্য পদবীর সৈন্য নিয়ে ২৫/২৬ মার্চ রাত আনুমানিক ১১টার সময় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং সংগ্রামে লিপ্ত হলেন।'

এখন ক্যাপটেন অলি আহমদের এই রাত ১১টার সময় ৩৫ বছর বয়স্ক মেজর জিয়ার বিদ্রোহের দাবী বিশ্বাস করলে ওই একই সেনাদলের লে. শমসের মবিনের এই দাবীর কী হাল হবে? বা.দে.স্বা.যু.দ.প. গ্রন্থের ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিত এই বিবৃতিতে লে. শমসের মবিন দাবী করেছেন এভাবে-

'রাত বারটায় আমি ষোলশহর ক্যান্টনমেন্টের গেটে গেলাম। সেখানে গিয়ে গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। বৃষ্টির মত গুলি হচ্ছিল। ক্যাপ্টেন অলিকে টেলিফোনে জানালাম যে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে ভীষণ গোলাগুলি হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না সেখানে ঠিক কি হচ্ছে। ক্যাপ্টেন অলি আমাকে সঠিক খবর নেবার চেষ্টা করতে বললেন এবং তাকে জানাতে বললেন। এমন সময় কিছু বাঙালি সৈন্যকে গেটের দিকে আসতে দেখলাম। তারা আমাকে বললেন যে, স্যার, বেলুচ রেজিমেন্ট আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে এবং আমাদের অনেককে মেরে ফেলেছে। কর্ণেল এম.আর. চৌধুরীকেও (ইবিআরসি চীফ ইন্সট্রাকটর) মেরে ফেলেছে। আমি সংগে সংগে তাদেরকে গাড়িতে উঠালাম এবং আমার সাথে ষোলশহরে এইটথ বেঙ্গলে নিয়ে আসলাম।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, লে. শমসের মবিন চৌধুরী এখানে যেটাকে 'ষোলশহর ক্যান্টনমেন্ট' বলছে আসলে সেটা হবে নতুনপাড়া সেনানিবাস। ষোলশহরে যে মিনি ক্যান্টনমেন্টটি ছিল তাতে অবস্থান করত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৮ম ব্যাটলিয়ন। ষোলশহর গেইট থেকে নতুনপাড়া সেনানিবাসের দক্ষিণের দূরত্ব বরাবর তিন কিলোমিটার। লে. শমসের মবিন চৌধুরী রাত বারটায় সেখানেই গিয়েছিলেন বলে বোঝাতে চেয়েছেন।

এখন আমরা আসল ঘটনা সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত নেব? আসলে ২৫ মার্চ রাত সাড়ে এগারটায় চট্টগ্রাম সেনানিবাস ও ৮ম বেঙ্গলে কী ঘটেছিল? মেজর জিয়া, মেজর শওকত, ক্যাপ্টেন এনাম, ক্যাপ্টেন অলি, লে. শমসের মবিন, লে. মাহফুজ প্রমুখের বর্ণনায় একজনের সাথে অন্যের এত গড়মিল কেন? এটা কি প্রকৃত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকারই ফলশ্রুতি? হয়ত বা তাই, নইলে একই ইউনিটের পাঁচজন সেনাপতি একই সময়কালকে নিয়ে পাঁচ রকম বিবৃতি দেবেন কেন?

এখানে একটা ব্যাপার একেবারে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়েছে যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫ মার্চ রাত ১১টা, ১১.৩০টা বা ১২টা, যে সময়কেই ধরা হোক না কেন, বাঙালি সৈন্যদের উপর আক্রমণ হেনেছে। ঢাকার ইপিআর হেড্ কোয়ার্টারে, চট্টগ্রামের

নতুনপাড়া সেনানিবাসে আর চট্টগ্রামের হালিশহরের ইপিআর কেন্দ্রে হয়েছে সে হামলা। লে. শমসের মবিন, লে. মাহফুজ, ক্যাপটেন অলি, ক্যাপটেন রফিক, মেজর শওকত এবং মেজর জিয়া প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন সে কথা।
এর থেকে আমরা স্থিরনিশ্চিত হলাম যে, নতুনপাড়া সেনানিবাস ও হালিশহর ইপিআর কেন্দ্র ছাড়া, ষোলশহর ২নং গেইটে অবস্থিত ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যদের কোনও রকম আক্রমণ প্রতি আক্রমণের সম্মুখিন হয় নি। তাঁরা যুদ্ধ করে নি। কেউ ওই রাতে শহীদও হন নি, গাজিও হন নি। অথচ এই ষোলশহর ২নং গেইটে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিজেদের নামে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে সূচনা করেছে বলে দাবী করে একটি প্রস্তর ফলক স্থাপন করেছে সিডিএ এভেন্যুর প্রবেশধারে। যুগ যুগ ধরে এই মিথ্যাচারের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে চট্টগ্রামবাসী অপমানিত হচ্ছে। রাস্তার মধ্যখানে স্থাপিত ওই প্রস্থরফলকে যা লেখা আছে ভুলভ্রান্তিসহ হুবহু তা এখানে পাঠকের অবগতির জন্য তুলে ধরা হল।
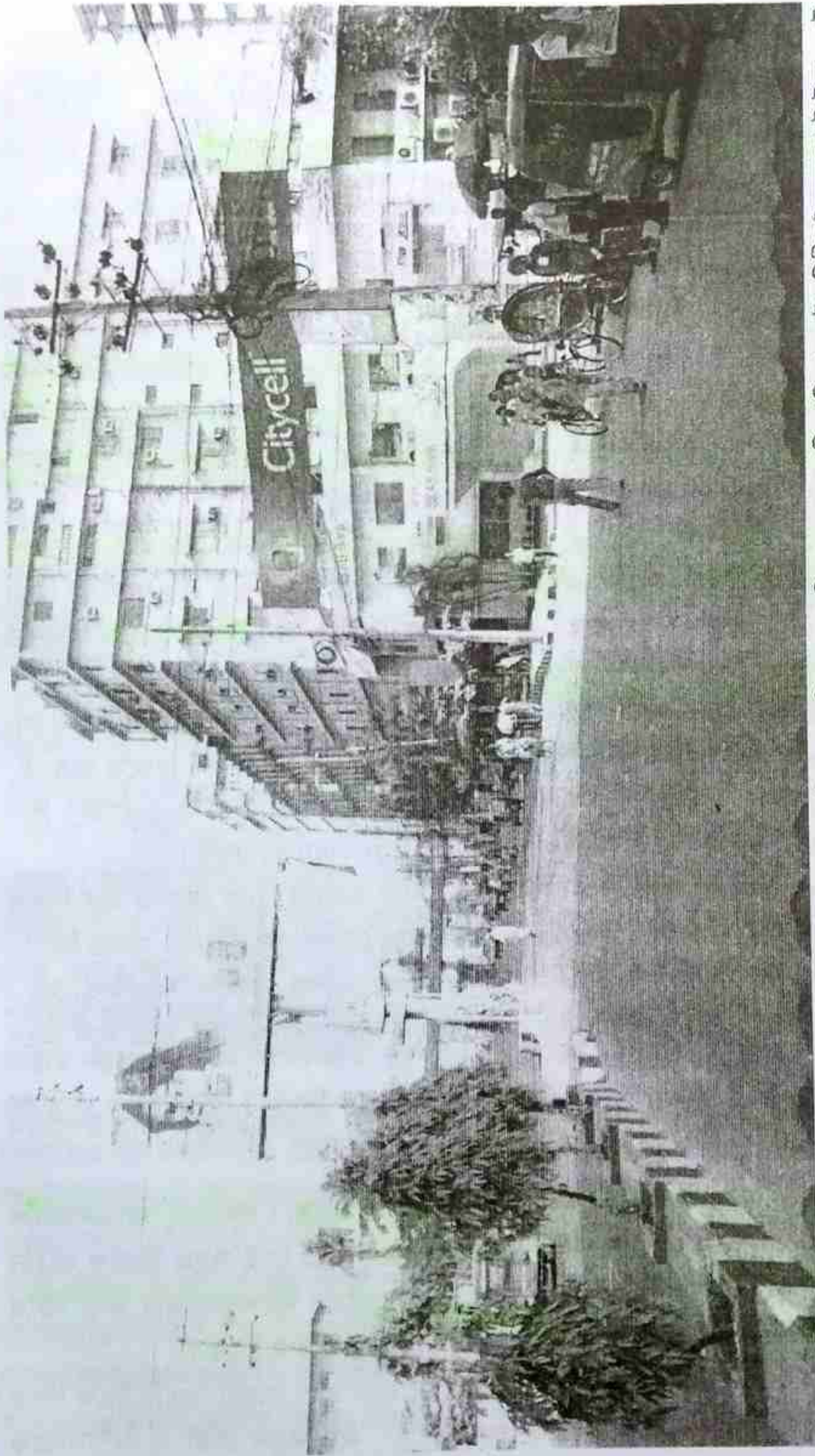
এটি সেই ঐতিহাসিক আগ্রাবাদ রোডের ব্যারিকেডের স্থান, যেখানে আটকে পড়েছিল মেজর জিয়াকে বহনকারী পাকিস্তান নৌবাহিনীর সৈন্যবোঝাই ট্রাক। এই ব্যারিক্যাটটি দিয়েছিল আগ্রাবাদ ঢেবারপাড় ও মোগলটুলির আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মিরা ব্যারিকেডটি থাকার কারণে ক্যাপটেন খালেকুজ্জামান মেজর জিয়াকে ধরতে পেরেছিলেন। যদি এখানে ব্যারিকেডটি না থাকত তাহলে ২৫ মার্চ রাতে মেজর জিয়ার রক্তে রঞ্জিত হত কর্ণফুলী নদীর পানি। যেমনটি হয়েছে বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ২০০জন বাঙালি সৈন্যের রক্তে।

ছয়

এবার আসা যাক ২৫ মার্চ রাত বারটার পর থেকে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও মেজর জিয়া, বাঙলাদেশের স্বাধীনতার জন্য কী অবদান রেখেছেন, তা দেখি। প্রথমেই আসি মেজর জিয়ার দাবীতে। তিনি বলেছেন-

রাত প্রায় সাড়ে এগারটায় জানজুয়া নিজে এসে তাঁকে নৌবাহিনীর একটি ট্রাকে তুলে ষোলশহর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বন্দরের দিকে রওনা করে দেন। কিন্তু রাস্তায় ব্যারিকেড সরিয়ে যেতে তাঁর দেরী হচ্ছিলো। আগ্রাবাদে যখন একটা বড় ব্যারিকেডের সামনে বাধা পেয়ে তাঁর ট্রাক দাঁড়িয়ে পরে তখনই পেছনে থেকে ছুটে আসে একটি ডজ গাড়ি। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান গাড়ি থেকে নেমেই দৌড়ে আসেন মেজর জিয়ার কাছে। হাত ধরে তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে যান রাস্তার ধারে।

ঃ পশ্চিমারা গোলাগুলি শুরু করেছে। শহরের বহু লোক হতাহত হয়েছে। খালেকুজ্জামানের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর থেকে কথা কয়টি ঝরে পড়ে। কি করবেন জিয়া ভাই, এখন? মাত্র আধা মিনিট। গভীর চিন্তায় তলিয়ে যান মেজর জিয়া। তারপর বজ্রনির্ঘোষে বলে ওঠেন- উই রিভোল্ট।' ৪২ পৃষ্ঠা, গ্রন্থ ঐ

মেজর জিয়া রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে আগ্রাবাদ পর্যন্ত পৌছাতে, আমরা ধারণা করছি, রাত বারটার উপরে হয়েছিল। বিশেষভাবে সকলকে খেয়াল রাখতে হবে যে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ষোলশহর থেকে টাইগার পাশ পর্যন্ত বর্তমান সিডিএ এভেন্যু ছিল ভাঙা-তেড়া, ইটের সোলিং করানো। সুতরাং যেতে সময় লাগবেই।

আমরা ধরে নিলাম, আগ্রাবাদে রাত ১২টা সোয়া বারটার দিকে কোনও এক নির্জন স্থানে ক্যাপটেন খালেকুজ্জামানের সামনে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন মেজর জিয়া। দুর্ভাগ্য, ক্যাপটেন খালেকের কোনও লেখা বাঙলাদেশের কোথাও সংরক্ষিত নেই। তাহলে এর সত্য মিথ্যা যাচাই করা যেত। এখন আমাদেরকে ওটাই সত্য বলে মেনে নিতে হচ্ছে।

কিন্তু তারপর মেজর জিয়া কী করলেন। আসুন পাঠক, আমরা এখন সেটাই উপভোগ কুরি।

“সাথে সাথে তিনি খালেকুজ্জামানকে ফিরে যেতে বলেন। বললেন, ব্যাটলিয়নকে তৈরি করার জন্য অলি আহমদকে নির্দেশ দিতে। আর সেই সাথে নির্দেশ পাঠান ব্যাটালিয়নের সমস্ত পশ্চিমা অফিসারকে গ্রেফতারের। খালেকুজ্জামান দ্রুত ফিরে গেলেন ষোলশহরের দিকে। আর মেজর জিয়া ফিরে এলেন ট্রাকে।”

এখানে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে ফিরে যেতে বলা এবং মেজর জিয়ার ট্রাকে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটি আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। ব্যাটলিয়ন তৈরী ও অফিসারকে

গ্রেপ্তারের নির্দেশের ব্যাপারটিও বেশ গোলমেল।
মেজর জিয়ার মতে সমস্ত পাকিস্তানি অফিসারকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ পাঠিয়েছেন তিনি ক্যাপ্টেন অলির কাছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, ক্যাপ্টেন অলি মেজর জিয়ার নির্দেশ পেয়ে সকল পাকিস্তানি অফিসারকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। কিন্তু আসলেই কি ক্যাপ্টেন অলি মেজর জিয়ার সেই নির্দেশ পেয়েছিলেন ? ক্যাপ্টেন খালেক মেজর জিয়ার পৌছার আগে ষোলশহর ক্যান্টনমেন্টে পৌছুতে পেরেছিলেন কি?
অথবা সত্যিই মেজর জিয়া ক্যাপ্টেন খালেককে তেমন কোনও নির্দেশ দিয়েছিলেন কি?
যদি সত্যি সত্যিই মেজর জিয়া ক্যাপ্টেন খালেককে সে রকম কোনও নির্দেশ দিয়ে থাকতেন, তাহলে ক্যাপ্টেন খালেক অবশ্যই মেজর জিয়ার বহু আগেই 'ডজ' গাড়ি নিয়ে ষোলশহরে পৌছাতেন এবং নির্দেশ মোতাবেক সকল পাকিস্তানি অফিসারকে ক্যাপ্টেন অলি গ্রেপ্তার করতেন (যদিও সেখানে পাকিস্তানি অফিসার বলতে তেমন কেউ ছিল না)। কিন্তু কার্যত এর কোনোটাই হয় নি। কারণ মেজর জিয়া ক্যাপ্টেন খালেককে ফিরে যেতে নির্দেশই দেন নি। তিনি খবর পাওয়ার পর ক্যাপ্টেন খালেকের সাথেই ষোলশহরে ফেরৎ আসেন। এ ব্যাপারে ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম সকল সন্দেহের অবসান করেছেন। তিনি তার 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' বইয়ের ৮৩ পৃষ্ঠার শেষ প্যারার ৫ম লাইন থেকে ৮৪ পৃষ্ঠার ২য় প্যারার শেষ লাইন পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন এভাবে – '**ঠিক এই সময়ে নৌ-বাহিনীর একটি গাড়ি আগ্রাবাদের দিকে এগিয়ে গেলো। আমার মর্টারার জেসিও সুবেদার আইজুদ্দিন গাড়ি দেখেই তাঁর অবস্থান থেকে দৌড়ে এসে বলল, 'স্যার, গাড়িতে কয়েকজন নৌ-সেনা রয়েছে। দেবো নাকি শেষ করে? আমি বললাম, 'না, এখন নয়। এটা বোধহয় পর্যবেক্ষণ গাড়ি। রাস্তা পরিষ্কার আছে কিনা দেখার জন্য এসেছে। মনে হয় সৈন্যদের আরো বড় দল এই রাস্তায় আসবে। সেই লক্ষ্যবস্তুই হবে আমাদের জন্য উত্তম। এক সংগে অনেক লোককে পেয়ে যাবো।' একটু পরেই আরেকটি গাড়ি একই পথে চলে গেলো। কিন্তু সৈন্যদের বড় দলটি আর এলোনা। মিনিট দশেক পর দু'টি গাড়িই ফিরে এলো এবং ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলে গেলো।**'
এরপর ক্যাপ্টেন রফিক লিখেছেন – '**পরবর্তীকালে জানতে পেরেছিলাম, প্রথম গাড়িতে করে মেজর জিয়া পোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর কমাণ্ডিং অফিসার লে. কর্ণেল জানজুয়ার নির্দেশে 'এম.ভি. সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র নামিয়ে ক্যান্টনমেন্টে আনার জন্য তিনি রওয়া়া হয়েছিলেন। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের চট্টগ্রামস্থ নিউ মার্কেট শাখার ম্যানেজার জনাব কাদের আমার বার্তা নিয়ে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দফতরে**

যান। তার আগেই মেজর জিয়া তাঁর কমাণ্ডিং অফিসারের আদেশে ষোলশহর থেকে বেরিয়ে পড়েন। রেজিমেন্টের ডিউটি অফিসার আমার বার্তাটি পান। খবর পেয়েই ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান মেজর জিয়াকে থামানোর জন্য পোর্টের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। ২৫শে মার্চের রাত তখন প্রায় সাড়ে ১১টা। ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা এরই মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের ওপর হামলা চালায়। ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য ও অফিসারবৃন্দ তখনো এ খবর জানতে পারেনি। পূর্বে উল্লেখিত দ্বিতীয় গাড়িতে ছিলেন ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান। আগ্রাবাদ পর্যন্ত গিয়ে মেজর জিয়াকে ব্যারিকেড পরিষ্কারের জন্য থামতে হয়। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান যখন আগ্রাবাদ পৌঁছেন তখন মেজর জিয়া সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যারিকেড পরিষ্কার করছিলেন। খালেকুজ্জামান মেজর জিয়াকে সর্বশেষ পরিস্থিতির কথা জানালে মেজর জিয়া ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর ইউনিট লাইনে ফিরে আসা এবং তাঁর অফিসারদের সঙ্গে করণীয় সম্পর্কে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেন। মেজর জিয়াকে বহনকারী প্রথম গাড়িটি দেখেই নায়েব-সুবেদার আইজুদ্দিন উত্তেজিত হয়ে আক্রমণ করতে চেয়েছিলো। রেলওয়ে হিলের পাশের এই সড়কের অনেক খানি আমাদের এলএমজি এবং রকেট লাঞ্চারের সুনির্দিষ্ট আওতার মধ্যে ছিল। আমরা ধৈর্য না ধরলে মেজর জিয়া এবং ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে বহনকারী গাড়ি দু'টি রকেট লঞ্চারের গোলায় উড়ে যেতো। আরো বড় শিকারের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম বলেই অলৌকিকভাবে সেদিন তাঁরা দু'জন বেঁচে গিয়েছিলেন।'

সুতরাং ক্যাপটেন রফিকুল ইসলামের বর্ণনা থেকে আমরা স্থিরনিশ্চিত হলাম যে, আগে-পরে নয়। ক্যাপটেন খালেকুজ্জামান আর মেজর জিয়া একই সময়ে আগ্রাবাদ থেকে ষোলশহর এসেছিলেন।

এর পরের প্যারাতে মেজর জিয়া নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে যা বর্ণনা করেছেন তা পড়ে তথ্যাভিজ্ঞমহল বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন। সেনাবাহিনী ও যুদ্ধ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মেজর জিয়ার নিচের বিবৃতি পড়ে হেসেই খুন হয়েছেন। পাঠক দেখুন, মেজর জিয়ার দাবী। তিনি বলেছেন-

'তাঁরা ফিরে আসেন ব্যাটলিয়নে। এসেই তিনি সাথের পশ্চিমা অফিসারকে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, তুমি এখন আমাদের হাতে বন্দি। অফিসারটি আত্মসমর্পণ করলে তিনি ট্রাক থেকে নেমে ট্রাকের পশ্চিমা নৌসেনাদের দিকে রাইফেল তাক করে তাদেরকেও অস্ত্র ছেড়ে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। হতচকিত পশ্চিমা সেনারা সবাই আত্মসমর্পণ করে।'

প্রিয় পাঠককে সেনাবাহিনীর নিয়মকানুন সম্পর্কে একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। নইলে পাঠক সমাজ মেজর জিয়ার উপরের লেখার ভেতরের ধোঁকাবাজিটা ধরতে পারবেন

না। ধরতে পারবেন না-কী সুক্ষ্ম কৌশলে মেজর জিয়া আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে দুনিয়ার সামনে খাটো করার চেষ্টা করেছিলেন।

সেনাবাহিনীতে শান্তি ও স্থিতাবস্থায় কোনও সিনিয়র অফিসার অস্ত্র বহন করে না। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ রাত সাড়ে এগারটায় যখন কর্ণেল আবদুর রশিদ জানজুয়া পাকিস্তান নৌবাহিনীর গাড়িতে মেজর জিয়াকে বন্দরে যাবার জন্য তুলে দিচ্ছিলেন তখনও ষোলশহর ২নং গেইটে কোনও যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দেয় নি। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, মেজর জিয়া নিরস্ত্র ছিলেন।

এ ব্যাপারে সকলকে আরও একটা বিষয় নিশ্চিত করতে চাই যে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ "সোয়াত" থেকে অস্ত্র খালাসের জন্য যেসব বাঙালি সৈন্যকে নিয়োগ করা হয়েছিলো তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন নিরস্ত্র। শুধু পশ্চিমা সৈন্যদের হাতেই তখন অস্ত্র দেয়া হয়েছিলো। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মেজর জিয়াও নিরস্ত্র ছিলেন। যদিও মেজর জিয়া পাকিস্তানি অনুগত সৈনিক ছিলেন। তবুও আমরা জানি সেদিন তাকে কোনও অস্ত্র বহন করতে দেয়া হয় নি।

এখানে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মেজর জিয়াকে কোনও বাঙালি সেনাইউনিটের গাড়িতে তুলে দেয়া হয় নি। তাঁকে তুলে দেয়া হয়েছে পশ্চিমা সেনাসমৃদ্ধ নৌবাহিনীর ট্রাকে। সুতরাং তিনি সাথের পশ্চিমা অফিসারকে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দেন কীভাবে? এবং এককভাবে ট্রাকে বসা সকল পশ্চিমা সৈন্যকে নিরস্ত্র করেন কীভাবে? ব্যাপারটি আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না কিছুতেই। এ প্রসঙ্গে ৮ম বেঙ্গলের কেউই কোনও উচ্চবাচ্য করেন নি। এটাও একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। এতবড় একটা ঘটনা নিয়ে কেউ কোনও মন্তব্য করলনা, এটা ভাবতেও আশ্চার্য লাগে।

মেজর জিয়ার তারপরের বর্ণনাটিতো আরও মারাত্মক। মহাবীর আলেকজাণ্ডারও সম্ভবত এ বর্ণনা শুনে হতভম্ব হয়ে যাবেন। তিনি লিখেছেন- **'এরপর তিনি একাই একটি গাড়ি নিয়ে ছুটে যান অফিসার কমাণ্ডিং জানজুয়ার বাড়ি। কলিং বেল টিপতেই ঘুম থেকে উঠে আসেন জানজুয়া। আর সামনেই মেজর জিয়াকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে ওঠেন। তার ধারণা ছিল পরিকল্পনা অনুযায়ী মেজর জিয়া বন্দরে বন্দি হয়ে রয়েছে। জানজুয়াকে গ্রেফতার করে নিয়ে ষোলশহরে ফিরে আসেন মেজর জিয়া।'**

'মেজর জিয়ার ভাষ্যমতে তিনি একাই কর্ণেল জানজুয়ার বাড়িতে যান তাকে গ্রেপ্তার করতে।' ব্যাপারটি যেমনি অবিশ্বাস্য তেমনি হাস্যকর।

একজন ব্যাটলিয়ন কমাণ্ডারকে তার সুরক্ষিত বাড়ি থেকে একজন মেজর কোনও বাধা বিপত্তি ছাড়াই সুরসুর করে ধরে নিয়ে আসল, এটা কীভাবে বিশ্বাস করা যায়? তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে, কর্ণেল জানজুয়ার বাড়িটি একেবারে অরক্ষিত ছিল? কর্ণেলকে রক্ষার জন্য কোনও সেপাই-শান্ত্রী কেউই ছিল না? এমন কি কর্ণেলের

অর্ডারলি, বাটলার, স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন কেউ ছিল না? কেউ কি সামান্যতম বাধাও দেয় নি? কর্ণেলের কাছে একটি রিভলবারও কি ছিল না?

রাত দেড়টা-দু'টোর সময় হুট্ হুট্ করে বাড়িতে প্রবেশ করে কলিং বেল টেপা এবং কলিং বেলের শব্দে ঘুম থেকে উঠে 'কে' 'কী' কিছুই জিজ্ঞেস না করে হুট করে দরজা খুলে 'সামনে মেজর জিয়াকে দেখে ভূত দেখার মত চকমে ওঠা', এ সব কি তাহলে আমাদেরকে বিশ্বাস করতেই হবে? ২৫ মার্চ এর মত নাজুক ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির মত সময়ের একটি রাতে, কর্ণেল জানজুয়ার মত একজন ব্যাটলিয়ন কামাণ্ডার একেবারে নিশ্চিন্তেই কলিং বেল টেপার সাথে সাথে হুট করে কাউকে দরজা খুলে দিতে পারেন? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কোনও কথা হল? একজন সাধারণ মানুষ, যার কোনও দায়-দায়িত্ব নেই, কোনও শত্রু-মিত্র নেই, তিনিও কি একেবারে নিশ্চিন্তে রাত দেড়টা-দুটোর সময় কোনও জিজ্ঞাসাবাদ না করে কাউকে হুট করে ঘরের দরজা খুলে দিতে পারেন? এটা কি কিছুতেই সম্ভব?

অন্যদিকে আমরা জানি একজন সামরিক কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করতে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে বিদ্রোহ করার সময়। এরজন্য চাই নিখুঁত নিশ্চিদ্র পরিকল্পনা। চাই টিম ওয়ার্ক। চাই অসম্ভব রকমের ক্ষীপ্রতা ও দূর্দান্ত সাহসিকতা। যেমনটি করেছিলেন ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম ও ক্যাপ্টেন হারুণ আহমদ চৌধুরী। তাঁরা দুজনেই ২৫ মার্চ রাতে বিদ্রোহ করতে গিয়ে বেশ কিছু সামরিক কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। তাঁদের বর্ণনাতেই সে সব ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে।

ক্যাপ্টেন রফিক লিখেছেন – **আমাদের প্রথম লক্ষ্যস্থল অয়্যারলেস কলোনীর দিকে আমাদের গাড়ি ছুটে চললো। আমর পাশে ড্রাইভার কালাম এবং পেছনের সিটে দু'জন রক্ষী। তীব্র উত্তেজনায় সবাই ঠোঁট কামরাচ্ছিলো। রাস্তা জনমানবশূন্য। আমাদের গাড়ি যতই অয়্যারলেস কলোনীর কাছাকাছি এগুচ্ছিলো, উত্তেজনা ততই বাড়ছিলো। একটা সরু রেল ক্রসিয়ের ওপর আসিতেই জীপ একটু লাফিয়ে উঠলে আমার চিন্তায় ছেড় পড়লো। আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। এখান থেকে আমি অয়্যারলেস স্টেশনের এনটেনা দেখতে পাচ্ছিলাম। নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আয়ারলেস স্টেশনের চারদিকে ছিলো কাঁটা তারের ঘেরা। যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে সেজন্য আমি ড্রাইভারকে গাড়ি আস্তে চালাতে বললাম। আমাদের এখানকার সাফল্য ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তামূলক ডিউটিতে নিযুক্ত ইপিআর-এর একটি প্লাটুনের মোকাবিলা করতে হবে আমাদের ৪ জনকে। ওদেরকে নিরস্ত্র করতে হবে। আমার রেকর্ড অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন হায়াত এবং সুবেধার হাসমত এই প্লাটুনের কমাণ্ডে ছিলেন। বাকী সেনারা সবাই ছিলো বাঙালি। আমাদের জানামতে এখানে আরো তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য ছিলো। অনুরূপভাবে নগরীর অন্যান্য**

এলাকাতেও ইপিআর প্লাটুন অবস্থান করছিলো। তবে অয়্যারলস কলোনীর এই প্লাটুনটি শুধু পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারের কমান্ডে ডিউটিরত ছিলো।
গেটে পৌছুতেই প্রহরারত শান্ত্রী জীপ থামিয়ে দিলো। বাঙালি শান্ত্রী প্রহরারত ছিলো। সে আমার জীপটি ভেতরে যাবার অনুমতি দিলো। আমরা ক্যাপ্টেন হায়াতের রুমের সামনে গিয়ে জীপ থামালাম। সেখানেও একজন শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছিলো।
সাবধানে আমি হায়াতের কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মারাত্মক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, হয় সফল হবো, না হয় আমার মাথা ভেদ করে একটা বুলেট বেরিয়ে যাবে। শেষেরটা সত্যি হলে চট্টগ্রামের ইপিআর সেনা পরিচালনা করতে আর কোনো বাঙালি অফিসার থাকবে না। এই চিন্তা আমাকে কিছুটা বিহ্বল করে তুললো ক্ষণিকের জন্য।
আমি খুব আস্তে দরজায় নক করলাম এবং বন্ধুসুলভ গলায় বললাম, 'হ্যালো হায়াত, ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি?'
'এই কেবল শুয়েছি স্যার।' আমার গলার স্বর চিনতে পেরে সে আলো জ্বালালো। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে আমি দেখলাম বালিশের তলা থেকে কি যেন একটা নিয়ে সে তার শোবার পোশাকের নিচে রাখছে। দরজা খোলার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো?'
'সব ঠিকঠাক হ্যায়' জবাব দিয়েই সে দরজা খুললো।
'প্লিজ ভেতরে আসুন স্যার, এবং-'
তার কথা শেষ না হতেই আমি স্টেনগান তার বুকের ওপর ধরে বললাম, 'আমি দুঃখিত হায়াত, তোমাকে গ্রেফতার করতে হচ্ছে।' হঠাৎ সে তার পিস্তল বের করার উদ্যোগ নিতেই ড্রাইভার কামাল দ্রুত এগিয়ে আসে এবং দুজনেই হায়াতের মাথায় আঘাত করি। সাথে সাথে আমরা হাত ও মুখ বেঁধে ফেললাম এবং টেলিফোনের তার কেটে দিলাম। তারপর পাশের ব্যারাকে ঘুমন্ত সুবেদার হাসমতকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালাম। সুবেদার হাসমত চোখ মুছতে মুছতে উঠে এসে স্যালুট দিয়ে দাঁড়াতেই কালাম এবং অন্য প্রহরীরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাসমতকে আটক করে হাত ও মুখ বেঁধে ফেলা হলো।

পাঠক গভীরভাবে লক্ষ্য করুন-ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম কিন্তু গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিলেন তারই সমকক্ষ একজন ক্যাপ্টেনকে, তার উপর সে ক্যাপ্টেন ছিল তারই জুনিয়র অফিসার। তা সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন রফিককে কী অসম্ভব ক্ষিপ্রতা ও সুনিপুণ কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল, তা চিন্তা করলেই মেজর জিয়ার কর্ণেল জানজুয়াকে-যিনি একাধারে সিনিয়র অফিসার তো বটেই উপরন্তু ব্যাটলিয়ন কমাণ্ডারও ছিলেন-গ্রেপ্তার করতে যাবার ব্যাপারটি সবকিছু ঘোলাটে করে দেয়। বিশেষ করে মেজর

জিয়া যেখানে নিজেই স্বীকার করেছেন যে, কর্ণেল জানজুয়া তাঁকে বন্দরে পাঠিয়েছিলেন বন্দি বা হত্যা করার উদ্দেশ্যেই। সেখানে আমরা কীভাবে বিশ্বাস করব যে, 'মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত' সেই আসামীকে দণ্ডপ্রদানকারী সেই হাকিম গভীর রাতে কলিং বেল টেপার সাথে সাথেই কোনও জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া হুট করে দরজা খুলে দেবেন এবং সুবোদ বালকের মত আসামীর পেছনে পেছনে হাতজোর করে চলে আসবেন?

ইপিআর-এর ক্যাপটেন হারুণ আহমদ চৌধুরী বিদ্রোহের সময় তার উপরস্থ সেনাঅফিসারকে গ্রেপ্তার করতে যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তাও পাঠক গভীরভাবে খেয়াল করুন। তিনি লিখেছেন- **'লাইনে পৌঁছে আমি সুবেদার মেজরকে ডাকি এবং সমস্ত কথা বলি। তাকে বলি, 'কোতে চাবি নিয়ে প্রস্তুত থাকেন। বাঁশি বাজালে কোত খুলে দেবেন।' ঐ রাতে গার্ড কমাণ্ডার ছিল একজন পাঞ্জাবী। তাকে ডেকে আমাদের দোতলায় সমস্ত এনসিওকে ডাকতে বললাম। আমার সাথের এনসিওকে তার আগেই উপরে পাঠিয়েছিলাম। গার্ড কমাণ্ডার উপর তলা থেকে নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বন্দি করি এবং অস্ত্র কেড়ে নেই। আমার কথামত কোয়ার্টার গার্ডের বাঙালি সৈনিকরা সঙ্গে সঙ্গে দোতলায় সিঁড়ির মুখে পজিশন নিতে থাকে। হুইসেল দেই, সমস্ত বাঙালি সৈনিকদের উপর থেকে নিচে নেমে আসতে বলি এবং অবাঙলিদের উপরে থাকতে বলি। কোনো অবাঙালি নামার চেষ্টা করলে গুলি করার হুকুম দেই। বাঙালিরা প্রস্তুত ছিল, তাই হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাঙালি নিচে নেমে আসে। কোত খুলে দেওয়া হয় এবং সকলের হাতে অস্ত্র-গোলাবারুদ তুলে দেয়া হয়। আমি তখন উইং কমাণ্ডার মেজর পীর মুহাম্মদকে নিরস্ত্র করতে গেলাম। কাপ্তাইতে তখন কতকগুলো পয়েন্ট ছিল, যে পয়েন্টে আমাদের ইপিআর বাহিনীর ৪/৫ জন পাহারাদার থাকতো। উইং কমাণ্ডারের বাসার সামনেই একটা পয়েন্ট ছিল, এই পয়েন্টের গার্ড ছিল বাঙালি। আমি তখন পয়েন্টের গার্ডটিকে নিরস্ত্র করি এবং তারপর মেজর পীর মুহাম্মদের বাসায় যাই। মেজর পীর মুহাম্মদ তখন ঘুমাচ্ছিলেন। ডাকাডাকিতে উঠলেন এবং তিনি আমাকে পোশাক পরা দেখে ঘাবড়ে গেলেন। তিনি আসলে বললাম, 'আপনি বন্দি। বাঙলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, আমি উইং এর দায়িত্ব নিয়েছি।' মেজর পীর মুহাম্মদ অস্ত্র ধরার চেষ্টা করলেন। আমি হুঁশিয়ার করে দেই, 'অগ্রসর হলে মৃত্যু।' তাঁকে বললাম, 'ঘরে থাকেন, কোনো অসুবিধা হবে না আপনার।' এই বলে বাইরে গার্ড রেখে আবার রুমের দিকে যাই। রুমে পৌঁছে দেখলাম ক্যাপ্টেনদ্বয় উঠে বসেছে। তাদেরকে বললাম, 'তোমরা বন্দি, এদেশ স্বাধীন।' পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন জাম্বরী উঠবার চেষ্টা করে, কিন্তু তার আগেই তাঁকে বন্দি করে ফেলি। ক্যাপ্টেন ফারুক পাঠান ছিল। সে খুশী হয়ে বললো, "ভালোই হলো, আমি তোমার অনুগত হয়ে বাঙলাদেশের সেবা করবো।'**

প্রকৃত প্রস্তাবে এটাই হল বিদ্রোহ করা এবং শত্রু-সৈন্য ও সেনাঅফিসারকে গ্রেপ্তার করার স্বীকৃতি পদ্ধতি। এপদ্ধতি ছাড়া শত্রুসৈন্য ও সেনাঅফিসারকে অন্য কোনও পদ্ধতিতে গ্রেপ্তার করা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। মেজর জিয়া যেভাবে হুট করে একা একা নিজে গাড়ি চালিয়ে নিঃশব্দে জানজুয়ার বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করার কথা বলেছেন, সেটা বিশ্বাসের পর্যায়ে পড়েই না। জানজুয়ার বাড়ির সামনে 'সেন্ট্রি' ছিল না বা অন্য কোনও রকম 'নিরপত্তা' ব্যবস্থা করা ছিল না, সেটা ভাবাই যায় না। ইপিআর উইং কমাণ্ডার মেজর পীর মুহাম্মদের বাসায় বা ক্যাপ্টেন হায়াতের বাসার সামনে যদি সশস্ত্র 'সেন্ট্রি' থাকে তাহলে ব্যাটলিয়ন কমাণ্ডার কর্ণেল আবদুর রশিদ জানজুয়ার বাসার সামনে কোনও 'সেন্ট্রি থাকবেনা, সেটা অবিশ্বাস্য। সুতরাং মেজর জিয়া যা বর্ণনা করেছেন, সেসব পড়লে সেটিকে গাঁজাখুরি গল্প বলা ছাড়া আর উপায়ন্তর থাকে না।

তার উপর মেজর জিয়া যদি কর্ণেল জানজুয়াকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসে থাকেন, তাহলে তিনি কোথায়? তাঁকে কি ষোলশহর সিডিএ মার্কেটের ভেতরে ৮ম বেঙ্গলের হেড কোয়ার্টারে আনা হয়েছিল? যদি ওখানে আনা হয়ে থাকে তাঁর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল? তাঁকে কি হত্যা করা হয়েছিল? যদি হত্যা করা হয়ে থাকে, তাহলে মীর শওকত আলী, ক্যাপ্টেন অলি আহমদ, লে. মাহফুজুর রহমান, লে. শমশের মবিন চৌধুরী এবং খোদ মেজর জিয়ার লেখায় তার স্বীকৃতি নেই কেন?

তবে সুধি পাঠককে আমি শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি যে, মেজর জিয়া কর্ণেল আবদুর রশিদ জানজুয়াকে গ্রেপ্তার করতে যান নি। শুধু নিজের বাহাদুরী ফলাবার জন্য ওই আজগুবী গল্পটি তিনি আমাদেরকে শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য! তিনি ধরা পড়ে গেছেন। কারণ, কর্ণেল আবদুর রশিদ জানজুয়া ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ অবদি বেঁচে ছিলেন। ওই ৯৫ খ্রিস্টাব্দেই তিনি স্বাভাবিক বার্ধক্যজনিত কারণে পাকিস্তানে তাঁর বাসভবনে মারা যান।

বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিসেস খালেদা জিয়া কর্ণেল জানজুয়ার মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় প্রটোকল ভেঙে ব্যক্তিগতভাবে যে শোকবার্তা পাঠান তারই পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসী জানল যে, আসলে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ২৫ মার্চ রাতে মেজর জিয়া কর্তৃক জানজুয়াকে গ্রেপ্তার বা হত্যা কিছুই করা হয় নি। তিনি বহালতবিয়তে বেঁচে ছিলেন নিজ দেশে, স্বগৌরবে। তিনি মারা গেছেন ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে।

আমরা এখন সুনিশ্চিত হলাম যে, মেজর জিয়া আগ্রাবাদ থেকে ফেরৎ আসার পরই ইতোমধ্যে যা যা দাবী করেছেন তা ছিল মিথ্যা ও বিভ্রান্তমূলক। এর মধ্যে সত্যের লেশমাত্রও ছিল না। এখন আমরা ৮ম বেঙ্গলের অফিসার্স মেসে সুখনিদ্রারত বাঙালি সেনাপতি মেজর মীর শওকত আলী সম্পর্কে মেজর জিয়া যা বলেছেন তা দেখি।

তিনি বলেছেন – **পথে অফিসার্স মেসে মেজর শওকতকে তিনি সব কথা বলতেই মেজর শওকত উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন এবং বিদ্রোহে তাঁর সাথে যোগ দেয়ার কথা ঘোষণা করে দ্রুত ব্যাটলিয়নে চলে আসেন।**

মীর শওকত রাত প্রায় দু'টোর সময় মেজর জিয়ার কাছে সব খবর শোনার পর, বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্য ব্যাটলিয়নে ফেরৎ আসার দাবী যদি সত্য হয়, তাহলে তাঁর রাত সাড়ে ১১টায় ক্র্যাক ডাউনের খবর শোনার খবরটি কী। এখানে কার কথা বিশ্বাস করব? মেজর শওকতের না মেজর জিয়ার?

সাত
এবার আমরা মেজর জিয়ার সাক্ষাৎকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে প্রবেশ করব। এ অংশে তিনি দাবী করছেন এভাবে। বলেছেন–

শুরু হয়ে গেল বিদ্রোহ। রাত তখন দুটো। ব্যাটলিয়নের আড়াইশোর মত বাঙালি সৈন্যকে একত্রিক করে তাঁদেরকে সব কথা বললেন মেজর জিয়া। সবাই একবাক্যে এই বিদ্রোহের প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। তাঁরা জানান, দেশের স্বাধীনতার জন্যে তাঁরা জান দিতে প্রস্তুত। কিছু সৈন্য ষোলশহরে রেখে বাকী সবাইকে নিয়ে মেজর জিয়া বেরিয়ে পড়েন কালুরঘাটের পথে।

মেজর জিয়ার নিজের দাবী, তাঁর বিদ্রোহ ঘোষণার সময় হল রাত দু'টো। এটা যদি সত্য হয় তাহলে ক্যাপটেন অলি আহমদের এ দাবীর কী হবে।

'জাতির এই চরম মুহূর্তে ও বিপদের সময় ৩৫ বছর বয়স্ক তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান আমাদের কয়েকজন এবং ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের মাত্র তিনশ অন্যান্য পদবীর সৈন্য নিয়ে ২৫/২৬ মার্চ রাত আনুমানিক ১১টার সময় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং সংগ্রামে লিপ্ত হলেন।' (-১৯৭ পৃ:)

মেজর জিয়া এবং ক্যাপটেন অলি দু'জনেই ৮ম বেঙ্গলের দায়িত্বশীল সেনাঅফিসার। দু'জন আবার হরিহর আত্মাও। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সূচনার বিদ্রোহের(!) সময় নিয়ে দু'জনের ভিন্নমত কেন? মেজর জিয়া তাঁর সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। আড়াই যুগ পরে ক্যাপটেন অলি তাঁর সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুর দাবীনামাকে ধুলিস্যাৎ করে দিলেন কেন? তিনি কি গুরুর লেখাটি পড়বার সময় পান নি? নাকি 'ধর্মের কল বাতাসেই নড়ছে'।

একই দাবীনামায় মেজর জিয়া লিখেছেন এরকম – 'কিছু সৈন্য ষোলশহরে রেখে বাকী সবাইকে নিয়ে রাত দুটোয় মেজর জিয়া কালুরঘাটের পথে বেরিয়ে পড়েন' আমাদের প্রশ্ন, কেন? চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ২০ বালুচ রেজিমেন্টের হাতে ঘুমন্ত ইবিআরসি'র বাঙালি সৈন্যদের যে অকাতরে মারা যাচ্ছিলেন সে কথা কি কোয়ার্টার মাস্টার অলি আহমদ বা লে. শমসের মবিনের কাছে শোনেন নি তিনি? যদি শুনে থাকেন, তাহলে ওদের উদ্ধারে নতুনপাড়া সেনানিবাসের দিকে এগিয়ে না গিয়ে, যেখানে কোনও যুদ্ধ বিগ্রহ নেই সেদিকে চলে যাবার মানে কী? যুদ্ধের ময়দানে আক্রান্ত সতীর্থদের উদ্ধারে এগিয়ে না গিয়ে যে যোদ্ধারা প্রাণ নিয়ে পালায় তাঁদেরকে ভদ্র ভাষায় কী বলে? কাপুরুষ?

মেজর মীর শওকত অবশ্য এভাবে পালিয়ে যাবার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যদিও সেটা ধর্তব্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা যায় না। কারণ, টাকা খরচ করে বহু কষ্ট ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সৈনিক তৈরী করা হয় যুদ্ধ করার জন্য। কোনও অজুহাতেই যুদ্ধক্ষেত্র

ছেড়ে সৈনিকের পলায়ন নিয়ম সিদ্ধ নয়। ততাপিও মেজর জিয়ার দল ২৫ মার্চ রাত দু'টোয় স্টেশন হেড্ কোয়ার্টার ছেড়ে নিরাপদ লোকালয়ে পালিয়েছিলেন।

আমরা এখন মেজর শওকতের সেই ব্যাখ্যাটা দেখি। তিনি লিখেছেন–

২৫শে মার্চ '৭১ রাতে ঢাকার হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়ার পরই আমরা চট্টগ্রামে আমাদের অধীনস্থ সমস্ত ব্যাটলিয়নকে হাতে নিয়েছিলাম। আমরা ভেবে দেখলাম যে, নতুনপাড়া ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানি বাহিনী নিয়ন্ত্রিত ট্যাঙ্ক ছিল। আমরা ছিলাম ষোলশহরে মাত্র দু'মাইল দূরত্বে। আমরা দেখলাম আমাদের হাতে কোনো ট্যাঙ্ক ছিল না এবং কোনো অস্ত্রশস্ত্রও আমাদের অর্থাৎ ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাতে ছিল না। ইতিপূর্বেই ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তানে চলে যাবে বলে অধিকাংশ অস্ত্রই পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমাদের হাতে শুধু ছিল কিছু রাইফেল এবং এলএমজি ধরনের স্বল্প সংখ্যক অস্ত্র। ভারী কোনো অস্ত্র ছিল না। আমার সাথেই জেনারেল জিয়া আলাপ করলেন। আমরা আলাপ করে দেখলাম যে আমার যদি ষোলশহর বিল্ডিং এর ভিতরে অবস্থান করি এবং এই অবস্থায় যদি ট্যাঙ্ক আসে, তাহলে আমরা ট্যাঙ্ক ঠেকাতে পারব না। কারণ ট্যাঙ্ক টেকানোর মত কোনো অস্ত্রই আমাদের কাছে ছিল না। ট্যাঙ্ক থেকে দু'তিনটা গোলা ছুঁড়লেই আমাদের অনেক সৈন্য মারা যাবে। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমাদের ঐ এলাকা থেকে বাইরে চলে যাওয়া উচিত এবং নিরাপদ দূরত্ব থেকে হেড্ কোয়ার্টার বেস্ বানানো উচিত। এছাড়া আমাদের অধীনস্থ জোয়ানদের শপথ নেয়া উচিত। শপথ নিয়ে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে তারপর যুদ্ধে যাওয়া উচিত। আমরা সোজা প্রথমে গেলাম কালুরঘাট সেখানে ভোর রাতের দিকে আমরা মার্চ করে গেলাম।- একাত্তরের রণাঙ্গন

৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাঅফিসারদের একজনের মতের সাথে অন্যের মতের অন্যান্য ক্ষেত্রে না মিললেও দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানি ট্যাঙ্ক, কামানের গোলার ভয়ে ষোলশহর মিনি ক্যান্টনমেন্ট থেকে প্রাণ নিয়ে পালানোর মতামতে সবারই মত এক। অন্তত মেজর জিয়া অন্য কোনও ক্ষেত্রে মীর শওকতের সাথে পরামর্শ না করলেও রাত ২টার সময় নিজেদের সুরক্ষিত সেনানিবাস ছেড়ে অন্যত্র পালানোর ব্যাপার নিয়ে ঠিকই পরামর্শ করেছিলেন। মেজর শওকতের ভাষাতেই তার প্রমাণ মিলল।

মেজর জিয়া তার বর্ণনায় বলেছেন কিছু সংখ্যক সৈন্য ষোলশহরে রেখে বাকী সবাইকে নিয়ে কালুরঘাটের দিকে পালিয়েছিলেন।

মেজর জিয়ার এ বর্ণনার সাথে বাস্তব অবস্থার কোনও মিল নেই। মীর শওকত বলেছেন- **ট্যাঙ্ক টেকানোর মত তাদের কোনও অস্ত্র নেই। পাকিস্তানি সৈন্যরা ট্যাঙ্কের গোলা ছুঁড়লে ব্যারাকের ভেতর তাদের সৈন্যরা মারা যাবে।**

যদি অবস্থা তাই হয়। তাহলে কিছু সংখ্যক সৈন্যকে বলির পাঁঠা হিসেবে রেখে যাওয়া

হচ্ছিল কোন্ আক্কেলে। মৃত্যুভয়ে সবাই যখন পালাচ্ছিল তখন কিছু সংখ্যকরা পাকিস্তানি ট্যাঙ্ক কামানের গোলা মোকাবিলা করার জন্য ষোলশহরে থাকবে কোন যুক্তিতে? তদুপরি মেজর শওকতের বর্ণনাতেই সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তাদের অধীনস্থ সকল জোয়ানই নিরাপদ দূরত্বে হেড্ কোয়ার্টার বেস বানানোর জন্য ও শপথ নেবার জন্য চলে গিয়েছিল। তবুও মেজর জিয়ার আরেক প্রিয়পাত্র লে. মাহফুজুর রহমানের বক্তব্যটি এখানে উদ্ধৃত করতে পারি।

লে. মাহফুজ লিখেছেন- 'At 2 o'clock morning, we left the unit, with all troops and arms amunitions available with the unit, crossed the kalurghat road railway bridge and made a temporary hide-out in the village.

লে. শমসের মবিন চৌধুরীর এ বক্তব্যটিও প্রাণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন- **'এখন এখানে থাকা আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। আমরা সবাই কালুরঘাটেরদিকে যাব, সেখানে গিয়ে আমরা সবকিছু রিঅর্গানাইজ করব এবং আমাদের পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করব।'**

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের সেনাঅফিসার ক্যাপটেন এস.এ ভূঁইয়া (সুবিদ আলি ভূঁইয়া) তাঁর লেখা 'মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস' গ্রন্থে লিখেছেন-

'যানবাহনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই পায়ে হেঁটে রওয়ানা দেওয়াই সমীচীন মনে করলাম। যান-বাহনের অপেক্ষায় থাকলে মূলবান সময় নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। দ্রুতপায়ে আমরা হেঁটে চলেছি। মনে দারুণ আশঙ্কা ও উদ্বেগ! কিন্তু এরই মধ্যে আমরা সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। পায়ে হেঁটে প্রায় সাতটার দিকে আমরা ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে গিয়ে পৌছলাম। কিন্তু কারো সাথেই দেখা হলো না। কি করা যায় সেই সংকট মুহূর্তে, কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু কথায় আছে, 'এ ড্রাইনিং ম্যাক ক্যাচেস এ স্ট্র'। আমার তখন প্রায় সেই অবস্থা।'

উপরের প্রমাণাদি থেকে আমরা নিশ্চিত হলাম যে, ষোলশহরে 'কিছু সংখ্যক সৈন্য' রেখে যাওয়ার মেজর জিয়ার দাবী ছিল একটি জাজ্বল্যমান মিথ্যাচার। এ দাবী সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, প্রকৃতই মেজর জিয়া সুনিপুণ কৌশলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে ভবিষ্যতের সামনে কালিমালিপ্ত করতে তৎপর ছিলেন।

এটি সেই ঐতিহাসিক কদুরখীল বড়ুয়াপাড়া প্রাইমারী স্কুল। ষোলশহর সিডিএ মার্কেট থেকে রাত দুপুরে পালিয়ে ভোর ৫টার সময় যেখানে এসে মেজর জিয়ার দল আত্মগোপন করেছিল। তরুণ সাংবাদিক বিমলেন্দু বড়ুয়ার নেতৃত্বে কদুরখীলবাসী এই সৈন্যদলটির সকলের চা-নাস্তার ব্যবস্থা করেছিল।

এটি সেই ঐতিহাসিক হুলাইন আমিন শরীফ চৌধুরী প্রাইমারী স্কুল। বোয়ালখালির করলডেঙ্গা পাহাড়ে অবস্থান নেয়া সুবিধা নয় মনে করে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল মেজর জিয়া ও তার দল।

আট

মেজর জিয়ার নিচের এই বর্ণনাটি খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য পাঠকের কাছে আমার সবিশেষ অনুরোধ রইল। কারণ, মেজর জিয়ার এই দাবীনামায় এমন কিছু উদ্ভট দাবী রয়েছে, যা গবেষণা করেও সমাধানযোগ্য নয় বলে আমরা বিশ্বাস। এ দাবীর মর্মার্থ উদ্ধার করতে হলে সব পাঠককে আবার ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ ষোলশহর ২নং গেইটে ফিরে যেতে হবে এবং সামরিক ও যুদ্ধবিদ্যায় প্রাজ্ঞ হতে হবে।

এবার দেখুন মেজরের দাবীনামাটি। তিনি বলেছেন-

২৬ শে মার্চ সকাল। আগের রাতে ঢাকা শহরে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে রাজধানীর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন পাকিস্তান বাহিনী। আর সেই আনন্দে সকাল হতেই পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের সদর দফতরে চলছিল মিষ্টি বিতরণ আর অভিনন্দন বিনিময়ের পালা। কিন্তু মুহূর্ত কয়েক পরেই তাদের মুখের হাসি ম্লান হয়ে যায়। মিষ্টি হয়ে যায় বিস্বাদ। চট্টগ্রামের যুদ্ধের খবর যখন তাদের কাছে পৌঁছালো তখন এক দারুণ সন্ত্রাসে আঁতকে উঠলেন তারা। পৃষ্ঠা-৪৪, গ্রন্থ-ঐ

পাঠক লক্ষ্য করুন, ২৬ মার্চ সকালে ঢাকা শহরে পুনর্দখল হওয়ায় পাকিস্তান বাহিনী আনন্দে মিষ্টি বিতরণ করছিল বলে দাবী করেছেন মেজর জিয়া। কিন্তু চট্টগ্রামে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের খবরে তাদের মিষ্টি বিস্বাদ হয়ে গেল এবং সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ল। এই ছিল মেজর জিয়ার ২৬ মার্চের উপলব্ধি এবং মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় বাঙালি জাতিকে তাঁর তরফ থেকে দেয়া মহাসন্দেশ।

সুপ্রিয় পাঠক, বিবেচনা করুন। ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের যে সকল সেনাঅফিসার নিজেদের কীর্তিকলাপের বর্ণনা দিয়ে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নিয়েছে, তাঁদের বর্ণনায় কোথাও কি একথা বলা হয়েছে যে, ২৫ তারিখ রাত থেকে ২৬ তারিখ সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানি হায়েনা বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা কোনও প্রচণ্ডরকম যুদ্ধে বা প্রতিরোধে লিপ্ত হয়েছিলেন কোথাও? একটা গুলিও কি ছুঁড়তে হয়েছে তাঁদের? একবারের জন্য একটা ভাঙা বন্দুকও কি কাঁধে নিতে হয়েছে ৮ম বেঙ্গলের কোনও সৈন্যকে? যদি তা না হয় তাহলে মেজর জিয়া ২৫ তারিখ সন্ধ্যা থেকে ২৬ তারিখ সকাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে যুদ্ধ হয়েছে বলে দাবী করলেন কীভাবে? অথবা ষোলশহর সিডিএ মার্কেট- যেখানে থেকে মেজর জিয়ার নেতৃত্বে ৮ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল সৈন্যসামন্তসহ রাত ২টার সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ট্যাঙ্ক-কামানের ভয়ে পালিয়েছিলেন- সেখানে নিচের এই স্মৃতি ফলকটি স্থাপন করলেন কীভাবে? রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল ও ক্ষমতার লোভে মানুষ এত নীচে নামতে পারে জানা ছিল না। জাজ্বল্যমান একটি মিথ্যাকে মানুষ এমন নির্লজ্জভাবে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাও জানা ছিল না।

পাঠক এবার লক্ষ্য করুন, রাত দুপুরে স্টেশন হেড্ কোয়ার্টার ছেড়ে নিরাপদ স্থানে পলাতক সৈনিকদলের প্রধান সেনাপতি ইতিহাসকে কীভাবে কলঙ্কিত করেছেন ষোলশহর ২নং গেইটের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে
অষ্ট ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
এই স্থানে সর্ব প্রথম প্রত্যক্ষ
লড়াই এর সূচনা করে
হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে-
২৫ শে মার্চ ১৯৭১ সালে

প্রস্তর ফলক স্থাপন ৩০ শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ ইং
অষ্টম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের চতুর্থ জন্মদিন

রক্ষনাবেক্ষনে ই বি আর সি

এখন পাঠকেই বিচার করুন, ৮ম বেঙ্গল এই গৌরবের স্মৃতি ফলক এখানে স্থাপনের যোগ্যতা অর্জন করেছিল কিনা ?

পাঠক লক্ষ্য করুন, দু' নম্বর গেইটের দক্ষিণে সিডিএ এভেন্যুর মোড়ে আইল্যাণ্ডের উপরে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে মেজর জিয়ার ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট যে স্মৃতিফলকটি স্থাপন

করেছে সেখানে লেখা আছে ২৫ মার্চ মেজর জিয়ার দল ষোলশহর ২নং গেইটে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াই শুরু করেছিল। আবার এদিকে মাত্র ২০ গজ দূরত্বে ৫ বছর পর ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে সেই মেজর জিয়া দাবী করছেন ২৬ মার্চ তিনি এখানে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে তিনি একই বিষয় নিয়ে দু'রকম দাবীনামা স্থাপন করলেন কেন? এর থেকে কী একথাই প্রমাণিত হয় না যে, তিনি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে পুরোপুরি সাবোটাজ করবার মানসেই এমন বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে দিয়েছেন?

এরপরের প্যারাতেও মেজর জিয়া এমন সব মন্তব্য করেছেন যা তাঁর বলার আওতায় পড়েই না। তার এই প্যারাগ্রাফটি পড়ে সাধারণ পাঠক, যারা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে সে সময়ের প্রতিরোধ যুদ্ধে জড়িত ছিলেন না এবং ৮ম বেঙ্গল ও মেজর জিয়ার কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না, তাঁরা মনে করবেন, বাঙলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সূচনাপর্বে মেজর জিয়াই সবকিছুরই কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। চট্টগ্রামের সব যুদ্ধ তাঁর নেতৃত্বেই হয়েছে। এবার পাঠক সেই দাবীনামাটি লক্ষ্য করুন। তিনি বলেছেন– **চট্টগ্রাম। পাকিস্তানিদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো চট্টগ্রাম। ২৭শে মার্চ সকালেই বিমান বোঝাই হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে গেল পুরো দ্বিতীয় কমাণ্ডো ব্যাটলিয়ন। চট্টগ্রামে যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরির জন্য মিঠা খানকে হেলিকপ্টারে পাঠানো হয়। বাঙালি সৈন্যরা গুলি করে সে হেলিকপ্টারটি ফুটো করে দেয়। একই সাথে বিমানে করে নামানো হতে লাগলো দ্বিতীয় কমাণ্ডো ব্যাটলিয়নকে। নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বাবরকে নিয়ে আসা হয় বন্দরে। এতে ছিল দুই ব্যাটলিয়ন সৈন্য। ডেস্ট্রয়ার, এক স্কোয়াড্রন ট্যাঙ্কও লাগানো হয় এই যুদ্ধে। জাহাজের গান থেকেও গোলা নিক্ষেপ হতে থাকে শহরের দিকে।** পৃষ্ঠা-৪৪, গ্রন্থ-ঐ

মেজর জিয়ার দাবী, চট্টগ্রাম পাকিস্তানিদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। খুবই সঠিক দাবী। চট্টগ্রাম সত্যিকার অর্থে পাকিস্তানিদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে। এতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু তাতে মেজর জিয়ার কী? তিনি কি চট্টগ্রাম শহরে, হালিশহরে, কুমিরায় বা শুভপুরে কোথায় তখন পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন?

না, চট্টগ্রাম শহরে বা এর বাইরে উত্তর চট্টগ্রামে যেখানে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে বাঙালিরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, সেখানে কোথাও তিনি বা তার দল ৮ম বেঙ্গল ছিল না। ইতিহাস সাক্ষি, ২৭ মার্চ বিকেল ৫টার আগে পর্যন্ত মেজর জিয়া ও তাঁর দল ৮ম বেঙ্গল পটিয়া থানা সদর থেকে চট্টগ্রাম শহরে পদার্পণই করে নি। এ ব্যাপারে সকল দলিল পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন হল।

নয়

মেজর জিয়ার দ্বিতীয় দাবী চট্টগ্রামে যুদ্ধের পরিকল্পনার জন্য মিঠা খানকে হেলিকপ্টারে পাঠানো হয়। বাঙালি সৈন্যরা সেই হেলিকপ্টার গুলি করে ফুটো করে দেয়।

উপরের অন্যান্য দাবীর মত এটাও মেজর জিয়ার কল্পনার ফসল এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিভ্রান্তের বেড়াজালে আটকে ফেলার পরিকল্পিত কৌশল।

আগেই বলেছি, মিঠা খান নামে পাকিস্তান আর্মিতে কোনও সেনাঅফিসার ছিলেন না। তবে এ.ও. মিঠ্ঠি নামে একজন জেনারেল ছিলেন। পদাধিকার বলে তিনি ছিলেন কিউএমজি (কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল)। সামরিক বাহিনী সম্পর্কে যাঁরা জ্ঞান রাখেন তাঁরা জানেন, যুদ্ধ পরিকল্পনায় পদাতিক বাহিনীর কমাণ্ডারদেরকেই পাঠানো হয়। সেখানে কিউএমজি'র কোনও কাজ থাকেনা।

তবে এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ২৭ মার্চ বিকেলে জালালাবাদ পাহাড়ে যে হেলিকপ্টারটি ইবিআরসি'র বেঁচে যাওয়া বাঙালি সৈনিকরা গুলি করেছিল সে হেলিকপ্টার বহন করছিল ঢাকার ১৪তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজাকে। মেজর জিয়ার দাবীকৃত কোনও জেনারেল মিঠা খানকে নয়।

এ ব্যাপারে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিকের উইটনেস টু সারেণ্ডার' গ্রন্থে যা লেখা আছে তা নিম্নরূপ। তিনি লিখেছেন- **হারিয়ে যাওয়া সেনাদলটির সন্ধান নিজেই নেবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম। তিনি ঠিক করেন, পরের দিন তিনি একটি হেলিকপ্টার নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। প্রথমে চট্টগ্রামে যাবেন। সেখানে থেকে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা রোডের ওপর দিয়ে উড়ে যাবেন। যদি ইতিমধ্যে দলটি কোনও রকম অগ্রগতি সাধন করে থাকে তাহলে তাদেরকে চট্টগ্রামের বাইরেই দেখতে পাবেন তিনি। তার হেলিকপ্টারটি ২০ বালুচ-এর এলাকায় নামার জন্যে চট্টগ্রাম পাহাড়ের ওপর এসে যে মুহূর্তে ডানা ঝাপটাতে শুরু করেছে তখনি সেখানে লক্ষ্য করে বিদ্রোহীরা হালকা অস্ত্র থেকে গুলিবর্ষণ করে। বিদ্রোহীরা উঁচু জায়গায় অবস্থান নিয়েছিল। গুলি লেগেছিল হেলিকপ্টারে। কিন্তু তেমন কোনও ক্ষতি হয় নি। নিরাপদে ভূমি স্পর্শ করলো। জিওসি তাড়াতাড়ি নামলেন। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ফাতেমী চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। কর্নেল বিজয়ী কণ্ঠে ইস্ট বেঙ্গল সেন্টার দখলের কাহিনী বর্ণনা করলেন। ৫০ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং ৫০০ বিদ্রোহীকে তিনি বন্দি করেছেন। কিন্তু চট্টগ্রামের বাদবাকী অঞ্চল তখনো বিদ্রোহীদের দখলে রয়ে গেছে।'**

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার হল যে, ২৭ তারিখ সত্যিই কিন্তু হেলিকপ্টারে করে একজন পাকিস্তানি সেনাপতি চট্টগ্রাম সেনানিবাসে এসেছিল এবং তার হেলিকপ্টারে

বাঙালিরা গুলিও লাগিয়েছিল। এখন এখানে আমার প্রশ্ন, আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি, তাতে মেজর জিয়ার কী? এ ঘটনার সাথে তিনি সম্পৃক্ত হন কীভাবে? নতুন পাড়াস্থ জালালাবাদ পাহাড় বা চন্দ্রনাথ পাহাড়ে কি মেজর জিয়া বা তার অনুগত সেনাদল ২৭ মার্চ উপস্থিত ছিল? এটা কি কিছুতেই সম্ভব হতে পারে? যদি না হয়, তাহলে কীভাবে তিনি এমন দাবী করেন যে, ২৭ তারিখ মিঠাখান এসেছিল চট্টগ্রামে যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে। এতবড় আজগুবি মিথ্যাচার তিনি করলেন কীভাবে? তদুপরি কোথায় জিওসি আর কোথায় কিউএমজি। কোথায় খাদিম হোসেন রাজা আর কোথায় এ.ও. মিঠ্ঠি। এমন আসমান জমিন ব্যবধানকে মেজর জিয়ার মত একজন সিনিয়র সেনাপতির 'জগাখিচুড়ি' বানিয়ে দেয়া শোভা পায় না। কিন্তু তারপরেও তিনি তাই করে ছেড়েছেন। একজনের ঘটনা অন্য জনের বলে চালিয়ে দিয়ে, তিনি শুধু নিজের দেউলিয়াত্ব ও অন্তসারশূন্যতাকেই প্রকটভাবে তুলে ধরেছেন, তাই-ই নয়, সাথে সথে তার অসততাকেও প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন; আর সঙ্গে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে করেছেন কলঙ্কিত।

দশ

২৭ মার্চ নিয়ে মেজর জিয়ার আরও কিছু দাবীদাওয়া আছে। আমরা এবার সে প্রসঙ্গে প্রবেশ করি।গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠার শেষ প্যারায় মেজর জিয়া যে দাবীনামা পেশ করেছেন তা এরূপ। তিনি বলেছেন–

এই বিরাট শক্তির মোকাবিলায় বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হবে না। একথা বাঙালি সৈন্যরা বুঝেছিলেন। তাই শহর ছেড়ে যাবার আগে বিশ্ববাসীর কাছে সে কথা জানিয়ে যাবার জন্যে মেজর জিয়া ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে যান। বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা মেজর জিয়াকে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

পাকিস্তানি বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে বাঙালি সৈন্যরা টিকতে পারবে না, একথা বলে মেজর জিয়া বীর বাঙালি সৈন্যদেরকে হেয় করেছেন। মেজর জিয়ার জানা থানার কথা নয় যে, ২৫ মার্চ রাত ৯.৩০টা থেকে ৩১ মার্চ বিকেল ৫টা পর্যন্ত ক্যাপটেন রফিকুল ইসলামের ইপিআর বাহিনী, পুলিশ, আনসার, প্রাক্তন সৈনিক, ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ, শ্রমীক লীগ ও ইবিআরসি'র সৈন্যরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে পাকিস্তানি বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই করেছে। মেজর জিয়া ৮ম বেঙ্গলকে নিয়ে ২৫ মার্চ রাতের আঁধারে শহর থেকে পালিয়ে বোয়ালখালী-পটিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে না গেলে তিনি অবশ্যই শহরের যুদ্ধের প্রকৃত খবর জানতে পারতেন।

মেজর জিয়ার এটাও হয়ত জানা ছিল না যে, বীর বাঙালি সৈন্যরা কেউই ২৭ মার্চ শহর ছেড়ে চলে যাবর প্রস্তুতি নেয় নি। ৩১ মার্চ বিকেলে কোর্ট বিল্ডিং পতনের আগে পর্যন্ত কোনও বাঙালি সৈন্য শহর ছেড়ে কোথাও যায় নি। ওটা মেজর জিয়ার মনগড়া দাবী এবং ক্যাপটেন রফিকুল ইসলামের কৃতিত্বকে খাটো করার অপকৌশল মাত্র। বরঞ্চ অবস্থা এই হয়েছে যে, চট্টগ্রাম শহরে যুদ্ধরত কোনও সৈনিককে বহদ্দারহাটস্থ "স্বাধীন বাঙলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র" পাহারা দেবার জন্য পাওয়া না যাওয়ায় বেতার কর্মী বেলাল মোহাম্মদ পটিয়া সদরে বিশ্রামরত মেজর জিয়া ও তাঁর দল ৮ম বেঙ্গলের একটি ক্ষুদ্র অংশকে বেতার কেন্দ্র পাহারা দেবার জন্য ২৭ মার্চ বিকেলে নিয়ে আসেন বহাদ্দারহাটে।

এ ব্যাপারে বেলাল মোহাম্মদ লিখিত 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' গ্রন্থ থেকে সেই বিশেষ অংশটি পাঠকের অবগতির জন্য তুলে ধরছি। বলাবাহুল্য, বেলাল মোহাম্মদ রচিত এই গ্রন্থটি মেজর জিয়া বাঙলাদেশের রাষ্ট্রপতি থাকাকালে প্রকাশিত হয় এবং জিয়া নিজে বেলাল মোহাম্মদের হাত থেকে এ গ্রন্থের কপি গ্রহণ করেন এবং এই মূল্যবান গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেন।

পাঠক, দেখুন বেলাল মোহাম্মদের দাবী –

কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবন অরক্ষিত। ওখানে পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা যায় নি। রাজনৈতিক দলের কাছে সে বিষয়ে সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। এখানে ওখানে টেলিফোন করেছিলাম। ব্যক্তিগত বন্ধুদের পরামর্শের জন্যে।
মূল্যবান তথ্য এবং উপদেশ দিয়েছিলেন চন্দনপুরার তাহের সোবহান। বলেছিলেন ঃ পাহারার জন্যে দরকার রাইফেলধারী জোয়ান। আমার জানামতে পটিয়ায় একদল বাঙালি সৈনিক আছে। একজন মেজরও আছেন সেই দলে। ক্যান্টমেন্টের বাইরে যারা আছে, তারা সবাই বঙ্গবন্ধুর সাপোর্টার। তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন পটিয়ায় গিয়ে।
পটিয়া থানায় মানুষের ভীড়। সবাই ইউনিফর্মধারী মিলিটারী এবং পুলিশের লোক। একটি চেনামুখ, মানিক মিয়া। চট্টগ্রামে আলাপ পরিচয় হয়েছিল বেশ আগে। বেগম মুশতারী শফীর সম্পর্কিত মামা।

ঃ এই যে, মানিক মামা, আপনি এখন এখানে?

ঃ আমি তো এই থানার ওসি।

ঃ ভালোই হলো। আচ্ছা, এখানে যে মিলিটারীরা আছেন, তাদের সিনিয়র অফিসার কে আছেন?

ঃ মেজর জিয়াউর রহমান।

ঃ ওর সাথে একটু দেখা করা যাবে?

মানিক মিয়া বলেছিলেন ঃ একটু অপেক্ষা করুন। আমি দেখছি। কিন্তু কি জন্যে দেখা করতে চান? তিনি জানতে চাইলে কি বলবো?

ঃ রেডিও থেকে এসেছি বলবেন।

অনুমতি পেয়ে আমি মাহমুদ হোসেন ভেতরে গিয়েছিলাম। মেজর জিয়াউর রহমান আমাদের অনুষ্ঠান শুনেছিলেন। সন্ধ্যো ৭টা ৪০ মিনিটে এবং রাত ১০টায়। আমাদের পরিচয় পেয়ে উল্লসিত হয়েছিলেন। বলেছিলাম; আপনার কাছে এসেছি একটা সাহায্য চাইতে। কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনটিতে যদি প্রহরার ব্যবস্থা করতে পারেন।
দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল। মেজর জিয়াউর রহমান আমাদেরকে কিছু খেয়ে নিতে বলেছিলেন। সেই টেবিল থেকে হাতে হাতে খাবার তুলে সবাই খেয়েছিলেন।
তিনটি লরীতে জোয়ানরা সজ্জিত হয়েছিলেন। একটু আগে-পরে যাত্রা করা হয়েছিল। একটি লরী অদৃশ্য হবার পর অন্যটি স্টার্ট নিয়েছিল। দু'টি লরী ছেড়ে যাবার পর আমরা যাত্রা করেছিলাম। সামনে মেজর জিয়াউর রহমানের জীপ। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গসহ। পেছনে আমাদের ট্যাক্সী।
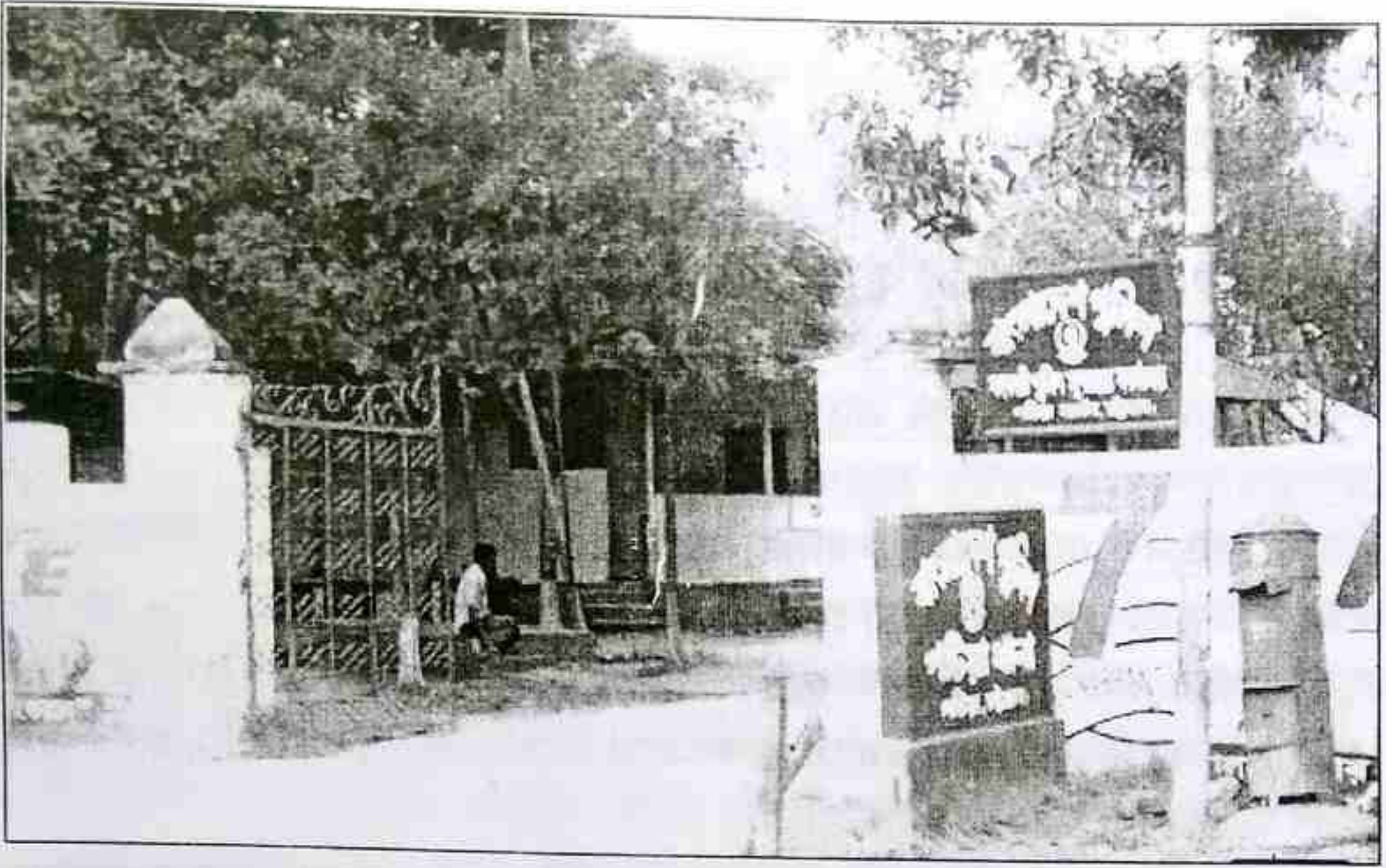
এটি সেই ঐতিহাসিক পটিয়া থানা : ২৭ মার্চ বিকেলে যেখান থেকে মেজর জিয়াকে বেতার কেন্দ্র পাহারা দেবার জন্য নিয়ে এসেছিলেন কবি বেলাল মোহাম্মদ।

এই হল মেজর জিয়ার সেই বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে টিকতে না পেরে শহর ছেড়ে চলে যাবার আগে বিশ্ববাসীকে তা জানানোর জন্য বেতার কেন্দ্র গমনের মূল ইতিহাস। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মেজর জিয়া তাঁর দল নিয়ে ২৫ মার্চ রাত দুপুরে ষোলশহর সিডিএ মার্কেট থেকে প্রথমে বোয়ালখালীর কদুরখীল বড়ুয়াপাড়া প্রাইমারী স্কুল, পরে পটিয়া থানার হুলাইন আমিন শরীফ প্রাইমারী স্কুল এবং ওই দিনই সন্ধ্যায় পটিয়া থানা সদরে গিয়ে যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁর এতবড় একটি সাক্ষাৎকারের কোথাও সেকথা বিন্দুমাত্রও উল্লেখ করেন নি। কৌশলে পুরো ব্যাপারটি তিনি বেমালুম চেপে গেছেন। এতে তার হীনমন্যতা প্রকট হয়েছে। বোয়ালখালী-পটিয়ার মানুষ মেজর জিয়া ও তাঁর দলের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছে, যে সম্মান দিয়েছে, তা তাঁর ভুলে যাবার কথা নয়। বিশেষ করে পটিয়ার ভাটিখাইনের বিখ্যাত বারিক মিঞা (বলি) মেজর জিয়ার জন্য যেভাবে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, সে কথা মেজর জিয়ার ভুলে যাওয়া কৃতঘ্নতারই নামান্তর।

শুধু মেজর জিয়ার কথাই বলছি কেন, এক মেজর শওকত ছাড়া, অন্যরা পটিয়ায় তাঁদের দীর্ঘদিনের অবস্থানের কথা বেমালুম চেপে গেছেন। মীর শওকতও ঘটনাচক্রে নিজের সাফাই গাইতে গিয়ে একটুখানির জন্য পটিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। বেতার কর্মকর্তা শামসুল হুদা চৌধুরী তাঁকে প্রশ্ন করেন–

৩০শে মার্চ '৭১ হানাদার বাহিনীর বোমারু বিমান থেকে চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে বোমা ফেলে ট্রান্সমিটারটি বিকল করে দিয়েছিল। এ সম্পর্কে কিছু বলুন। উঃ আমি সেদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য পটিয়া গিয়েছিলাম। ওখানে আমার প্রধান কাজ ছিল ছাত্র-জনতাকে যুদ্ধের জন্য সংগঠন করা। বোমা ফেলার পর কয়েকজন বেতার কর্মী তাদের একটি ওয়ারলেস সেট সরিয়ে পটিয়াতে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন। কিছু লোক, কিছু ইপিআর, কিছু আর্মি এবং কয়েকজন বেতার কর্মী সমন্বয়ে ছিল এই দল। তাঁরা ঐ ওয়ারলেস সেট নিয়ে আমাদের বললেন যে মেজর জিয়া বলেছেন এটাকে রামগড় পাঠিয়ে দিতে। আমি কিছু সৈন্য দিলাম। তারা বান্দরবনের পথে ওয়ারলেস সেটটি নিয়ে চলে গেলেন।

৮ম বেঙ্গলের নিয়মিত সৈন্য নয় অথচ পটিয়াতে ৮ম বেঙ্গলের সাথে থেকেছে এবং ৯ থেকে ১১ এপ্রিলে সংঘঠিত কালুরঘাট যুদ্ধে মেজর মীর শওকতের নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে গিয়ে পাকিস্তানি গোলার আঘাতে আহত ইপিআর বাহিনীর কাপ্তাই উইং-এর বাঙালি সেনাঅফিসার ক্যাপটেন হারুণ আহমদ চৌধুরীই একমাত্র সৈনিক যিনি পটিয়ায় তাঁর অবস্থানের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। ক্যাপটেন হারুণের লেখায় মেজর জিয়ার পটিয়ায় অবস্থানের উল্লেখ থাকায় এটার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে কিছু বর্ধিত অংশসহ প্যারাগ্রাফটি পুনঃস্থাপিত হল। ক্যাপটেন হারুন বলেছেন-

২৬শে মার্চ আমি যখন চট্টগ্রাম শহর থেকে ৭/৮ মাইল দূরে ছিলাম, তখন দেখলাম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েকজন সৈন্য পটিয়ার দিকে দৌড়াচ্ছে। তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম পাকবাহিনী আক্রমণ করেছে এবং মেজর জিয়া সহ ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছে। তাঁরা পটিয়াতে একত্রিত হবে। আমি অগ্রসর হলে মেজর জিয়ার সাক্ষাৎ পাই। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বললেন, 'ক্যাপ্টেন রফিক শহরে যুদ্ধ করছে, আমরা ৮ম ইস্ট বেঙ্গল পটিয়াতে একত্রিত হবো। তারপর আবার শহরে এসে পালটা আক্রমণ চালাবো।' আমাকে তার সাথে থাকতে বললেন। আমি মেজর জিয়ার সঙ্গে থেকে গেলাম। এরপর মেজর জিয়ার কমাণ্ডে কাজ করতে থাকি। পটিয়াতে আমরা সবাই মেজর জিয়ার নেতৃত্বে শপথ নেই। কালুরঘাটে পাকবাহিনী ব্যাপকভাবে চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। ১১ই এপ্রিল পাকসেনারা চারদিক থেকে বৃষ্টির মত গোলা ফেলতে থাকে।

ঐ তারিখে আমি এবং শমসের মুবিন চৌধুরী গুরুতররূপে আহত হই। আমকে পটিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। ডাঃ নুর হোসেন (অস্ত্র বিশেষজ্ঞ) পটিয়াতে আমার অস্ত্রোপচার করেন। তারপর আওয়ামী লীগের লোকজন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিয়ে ফিরতে থাকে।

ক্যাপটেন হারুণ আহমদের উপরের বর্ণনা নিয়ে একটু আলোচনা হওয়া দরকার। নইলে পাঠকের বিভ্রান্তি থেকে যাবে। ক্যাপটেন হারুণ বর্ণনা করেছেন, ক্যাপটেন হারুণ পটিয়াতে মেজর জিয়ার নেতৃত্বে শপথ নেন। তারপরে মাঝখানে আর কিছু না বলে হুট করে চলে গেলেন কালুরঘাটযুদ্ধে। ক্যাপটেন হারুণের এই বর্ণনা পড়ে সাধারণ যে কোনও পাঠক মনে করবে কালুরঘাটযুদ্ধ বুঝি মেজর জিয়ার নেতৃত্বেই হয়েছে। আসলে কিন্তু তা নয়। আগেও একবার উল্লেখ করেছি। মেজর জিয়া ৩০ মার্চ বহদ্দারহাটস্থ **স্বাধীন বাঙলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে** পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে মাত্র ১ ঘণ্টার নোটিশে তাঁর দলের সবাইকে পেছনে রেখে রামগড়ের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত বর্ণনায় আসছি একটু পরে।

কালুরঘাটযুদ্ধ সম্পর্কে মেজর জিয়ার বর্ণনাও এমন রহস্যবৃত্ত যে, যে কোনও সাধারণ পাঠকের এই ধারণা জন্মাবে যে, কালুরঘাটের সেই মহান যুদ্ধটি নেতৃত্ব নিশ্চয় মেজর জিয়াই দিয়েছেন। পাঠক এবার সেই বর্ণনাটি দেখুন। তিনি বলেছেন–

১১ই এপ্রিল পর্যন্ত কালুরঘাটে থেকে তাঁরা চট্টগ্রামের যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাঁদের সাথে যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো ২০তম বালুচ রেজিমেন্ট, কুমিল্লা থেকে নিয়ে যাওয়া ৫৩ ব্রিগেড। আর নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো কমাণ্ডো, যারা অবাঙালিদের ঘরে ঘরে ঘাঁটি গেড়েছিল।

এদেরকে ছাড়া চট্টগ্রামের এই যুদ্ধে বাঙালিদের বিরুদ্ধে লাগানো হয়েছিল কোয়েটা থেকে নিয়ে আসা ১৬শ ডিভিশন ও প্রথম কমাণ্ডো ব্যাটলিয়নকে।

উপরের বর্ণনাতে মেজর জিয়া দাবী করেছেন, ১১ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁরা কালুরঘাটে থেকে চট্টগ্রামে যুদ্ধ চালিয়ে যান। পাঠক গভীরভাবে লক্ষ্য করুন মেজর জিয়া কী বলেছেন। তিনি বলেছেন– **কালুরঘাটে থেকে মেজর জিয়ার দল চট্টগ্রামের যুদ্ধ চালিয়ে যান ১১ এপ্রিল পর্যন্ত**। তাঁরা বলতে এখানে মেজর জিয়াকেই বোঝানো হয়েছে।

মেজর জিয়া বোঝাতে চেয়েছেন-পটিয়া নয়, কালুরঘাটে থেকেই তিনি চট্টগ্রামে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। এখন চট্টগ্রামের যুদ্ধ বলতে তিনি কোনখানের যুদ্ধকে বোঝাতে চেয়েছেন আমাদের তা বোধগম্য হচ্ছে না। মেজর জিয়ার সহযোদ্ধাদের মাঝে কেউই কালুরঘাট থেকে চট্টগ্রামের যুদ্ধ চালানোর কথা উল্লেখ করেন নি। আমরাও জানি, মেজর জিয়ার নেতৃত্বাধীন ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট এক কালুরঘাট যুদ্ধ ছাড়া চট্টগ্রাম শহরে আর কোনও যুদ্ধে অংশ নেন নি। তাহলে মেজর জিয়া এমনভাবে নিজের কৃতিত্ব দাবী করলেন কেন? তিনি কি জানতেন না তিনি ছাড়াও ৮ম বেঙ্গলে আরও অনেক সেনাঅফিসার আছেন যারা তাঁর এই মিথ্যাচারকে কোনও না কোনোদিন চ্যালেঞ্জ করবে? যেমন করেছেন মেজর শওকত আলী। তিনি দাবী করেছেন–

৩০শে মার্চ, '৭১ -এর পর জেনারেল জিয়া আমার সাথে আর ছিলেন না। তিনি রামগড় হয়ে সীমান্তের ওপারে চলে গিয়েছিলেন। কাজেই ৩০শে মার্চ, '৭১ এর পর থেকে উল্লিখিত সেক্টরের পুরো বাহিনীর কমাণ্ড আমার হাতে এসে পড়ে। আর্মি, ইপিআর, ছাত্র-জনতা এবং আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে গঠিত বাহিনী নিয়ে ২রা মে, '৭১ পর্যন্ত বাঙলাদেশের অভ্যন্তরে থেকে আমি পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছি। ২রা মে, '৭১ বিকেলে আমরা সীমান্তের ওপারে চলে গিয়েছিলাম। একাত্তরের রণাঙ্গন' পৃঃ ১৭২।

উপরন্তু মেজর শওকত মেজর জিয়ার এ ধরনের পলাতক স্বভাব ও কিছু না করে সব করার দাবী করায় অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তার সাক্ষাৎকারে। কারও নাম উল্লেখ না করে পরোক্ষভাবে তিনি যে মেজর জিয়াকে লক্ষ্য করেই নিচের মন্তব্যটি করেছেন সেটা সচেতন পাঠক মাত্রই বুঝতে পারবেন। পাঠক এবার লক্ষ্য করুন মেজর শওকতের দাবী-

দুঃখ আমার এটাই যে যারা খুব তাড়াতাড়ি সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গেলেন তাদের নামই বিভিন্নভাবে প্রচারিত হল। আমি তখন উল্লেখিত এলাকাগুলি আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখে পুরা ব্যাটলিয়ন এবং ইপিআরকে নিয়ে বাঙলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তান বাহিনীর সাথে যুদ্ধরত। অথচ আমার নাম আপনি বাঙলাদেশ ডকুমেন্টের কোথাও দেখবেন না। আপনি একজন ক্যাপ্টেন-এর নামও দেখবেন।

কিন্তু সেক্টর কমাণ্ডার হিসেবে আমার নাম দেখবেন না। আমি আজো বুঝতে পারছি না, আপনি যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ করলেন, তখন দেশের অভ্যন্তরে যতক্ষণ পারা যায় যুদ্ধ না করে কেন আপনি বর্ডার অতিক্রম করে ভারতে চলে গেলেন। পৃষ্ঠা-ঐ, গ্রন্থ-ঐ

আসলেই মেজর মীর শওকতের ক্ষোভ ন্যায়ত ঠিক। মর্মান্তিকভাবে তিনি তাঁর কাজের অনুপাতে যথেষ্ট স্বীকৃতি পান নি। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে সব বড় বড় যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। অথচ নেপথ্যে এর সকল দাবীদার হয়েছেন মেজর জিয়া। মেজর মীর শওকত আলীর মত এতবড় মাপের একজন বীর সেনাপতির প্রতি এই অবেহলা ও অবমাননা সত্যিই দুঃখজনক।

১১ এপ্রিলের কালুরঘাট যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়েও মেজর জিয়া পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ও তাদের অবস্থান সম্পর্কে এখানে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা ছিল চরম বাড়াবাড়ি। তাঁর মতে কালুরঘাট যুদ্ধে ২০ বালুচ রেজিমেন্ট, কুমিল্লা থেকে নিয়ে আসা ৫৩ বিগ্রেড ও কমাণ্ডো বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

কালুরঘাট যুদ্ধ মেজর জিয়া দেখেন নি। কিন্তু আমি দেখেছি। আমি এ যুদ্ধে একজন সরাসরি যোদ্ধা ও প্রত্যক্ষদর্শী। সুতরাং আমার দেখা ও অংশ নেয়া যুদ্ধ সম্পর্কে অন্য আর একজন অপ্রত্যক্ষদর্শী যদি অতিরঞ্জিত ও অসত্য বক্তব্য দেয়, তখন তাঁর জন্য আমার করুণা ও ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

কালুরঘাটে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল এটা সত্য। এ যুদ্ধে দু'পক্ষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, এটাও সত্য। তবে 'নিশ্চিহ্ন হয়েছিল', এটা বলা বোকামীর একশেষ। বরং এটাই চরম সত্য কথা যে, ৩১ পাঞ্জাব গোলান্দাজ বাহিনী ও ৫৩ ব্রিগেডের সামনে টিকতে না পেরেই ১২ এপ্রিল মীর শওকত বাহিনী কালুরঘাট থেকে পার্বত্য-চট্টগ্রাম এলাকায় চলে যান। অন্যদিকে লে. মাহফুজ বাহিনী কাপ্তাই রোড ধরে পিছু হটতে থাকেন রামগড়ের দিকে।

অপরদিকে আমরা যে যেদিকে পারি পালিয়ে প্রাণ বাঁচাই। এ ছিল প্রকৃত যুদ্ধের পরিস্থিতি। যা সত্য তা সকলকে স্বীকার করতেই হবে। অতিরঞ্জিত করে নিজের বাহাদুরী ফলাবার চেষ্টা করলে, কিছুদিনের জন্য তা সফল হলেও, একদিন না একদিন তা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে যেতে বাধ্য। তবে এক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস, মেজর জিয়া যা লিখেছেন, যা বলেছেন তার সবই ইচ্ছাকৃত ও সুপরিকল্পিত। বিশ্বদরবারে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে কলংকিত করার মানসেই তা করেছেন তিনি।

মেজর জিয়ার ভাষ্য মতে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী যদি কালুরঘাট যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়েই যায়, তাহলে ১২ এপ্রিল থেকে সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চলে যে হাজার হাজার পাকিস্তানি সৈন্য গ্রাম গ্রামাঞ্চলে ঢুকে গণহত্যা শুরু করে, তারা কোত্থেকে এল? কালুরঘাটের ভয়াবহ যুদ্ধের ব্যাপারে লে. মাহফুজুর রহমান ছাড়া কেউই বিশদ বিবরণ দেন নি।

লে. মাহফুজও শুধু তাঁর দ্বারা সংঘঠিত যুদ্ধের বর্ণনাই দিতে পেরেছেন। পুরো ব্যাপারটা তাঁর লেখাতে আসেনি। সুতরাং আমার বিশ্বাস জন্মেছে কালুরঘাট যুদ্ধ নিয়ে মেজর জিয়ার মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে ওই যুদ্ধে কে কে অংশগ্রহণ করেছিল এবং কে কোথায় অবস্থান নিয়েছিল দেশবাসীর তা জানা দরকার। এ ক্ষেত্রে কালুরঘাট যুদ্ধের স্থরবিন্যাসটি যা আমার চোখের সামনে হয়েছে- তা এখানে তুলে ধরা জরুরী বলে আমার মনে হয়েছে। সে হিসাবে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আমার লেখা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ **'বাঙাল কেন যুদ্ধে গেল'** থেকে নিচের অংশটি উপস্থাপন করলাম।

'অতএব, ছুটলাম কালুরঘাটের দিকে। কালুরঘাট গিয়ে আমার নয়ন মন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। দেখলাম আমাদের বীর সেনানীরা মেজর মীর শওকত আলীর নেতৃত্বে কালুরঘাটের পশ্চিম-পূর্ব উভর তীরে প্রায় ছয় বর্গমাইল এলাকা জুড়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেছেন।

ইপিআইডিসি রোড, হামিদচর, চররাঙামাটিয়া, বাইন্যাপাড়া, চৌধুরীপাড়া, বাহার সিগন্যাল, মন্টি টেনারী সমগ্র মোহরা হয়ে কালুরঘাটের ব্রীজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকটা আমাদের বীর যোদ্ধারা পরিখা খনন করে স্তরে স্তরে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওতপেতে আছে শিকারের আশায়।

কালুরঘাট যুদ্ধের মূল কমাণ্ডার মীর শওকত আলী তাঁর অধীনস্থ কমাণ্ডারদের ছয় বর্গমাইল এলাকা জুড়ে যেভাবে যুদ্ধের জন্য সাজিয়েছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ।

চকবাজারের দিক থেকে আসা আরাকান রোডের চররাঙামাটিয়া-ইপি আইডিসি রোড এলাকায় কোম্পানী কমান্ডার লেফটেন্যান্ট শমসের মবিন চৌধুরীর নেতৃত্বে এক কোম্পানী যোদ্ধা। বাহার সিগন্যালের গোড়া থেকে কাপ্তাই রোডের মাথা হয়ে পেছনে মধুনাঘাট পর্যন্ত লেফটেন্যন্ট মাহফুজুর রহমানের নেতৃত্বে এক কোম্পানী যোদ্ধা। হামিদচর, মোহরা, কালুরঘাট ব্রিজের পশ্চিম কূলে ক্যাপটেন হারুণ আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বে এক কোম্পানী যোদ্ধা।

কালারপুল খালের মুখ থেকে কালুরঘাট ব্রিজের দক্ষিণ পর্যন্ত কর্ণফুলী নদীর পূর্বকূলে ক্যাপটেন খালেকুজ্জামানের নেতৃত্বে এক কোম্পানী যোদ্ধা, কালুরঘাট ব্রিজের উত্তরে কর্ণফুলীর পূর্ব তীরে চরণদ্বীপ-কদুরখীল এলাকায় ক্যাপটেন অলি আহমদের নেতৃত্বে এক কোম্পানী যোদ্ধা।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কালুরঘাট রণাঙ্গনে ক্যাপটেন অলি আহমদের সৈন্যদলকে পাকিস্তানি যোদ্ধাদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে অংশ নিতে হয় নি। কেন না কর্ণফুলীর পূর্বতীরে বিশেষ করে কালুরঘাট ব্রিজের উত্তরে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ফিল্ড আর্টিলারি এবং পাকিস্তানি যুদ্ধ জাহাজ 'জাহাঙ্গীর' যেতেই পারে নি।

কালুরঘাট যুদ্ধে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছাড়াও ইপিআর এর কাপ্তাই ও রাঙামাটি

উইং, পুলিশ, আনসার, প্রাক্তন সামরিক বাহিনী, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, স্বাধীনতার সপক্ষের সর্বস্তরের যুবকশ্রেণী ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে।
৯ এপ্রিল শুক্রবার বিকেলে প্রথমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ফিল্ড আর্টিলারী দলের মুখোমুখি হয় আমাদের বীর যোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শমসের মবিনের সৈন্য বাহিনী। লেফটেন্যান্ট শমসের মবিন চৌধুরী বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে ১০ তারিখ বিকেল পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখেন। ১০ তারিখ রাতে কর্ণফুলী নদীতে অবস্থানরত পাকিস্তান নেভীর যুদ্ধ জাহাজ পিএনএস জাহাঙ্গীর থেকে প্রচণ্ড রকম শেলিং করতে থাকলে লেফটেন্যান্ট শমসের মবিন পিছু হাটতে বাধ্য হন এবং এক পর্যায়ে তিনি পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়ে যান।
১১ তারিখ যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। বাহার সিগন্যালের গোড়া থেকে কালুরঘাট ব্রিজের পশ্চিম পাড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় আমাদের দুই মহান বীর যোদ্ধা লেফটেন্যান্ট মাহফুজুর রহমান ও ক্যাপটেন হারুণ আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১১ তারিখ বিকেল পর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় পাকিস্তানি ফিল্ড আর্টিলারি ও পেছনে পেছনে আসা ৩১ পাঞ্জাব ইনফেন্ট্রি সৈন্যদলের সাথে। এদিন পাকিস্তান আর্টিলারির ছুঁড়ে মারা এক গোলার আঘাতে কোম্পানী কমাণ্ডার ক্যাপটেন হারুণ আহমদ চৌধুরী কালুরঘাটের পশ্চিম তীরে আহত হন।
১১ তারিখ সন্ধ্যার মধ্যেই যুদ্ধের গতি নির্ধারিত হয়ে গেল। পাকিস্তান ফিল্ড আর্টিলারি ও পিএনএস জাহাঙ্গীরের অবিরাম শেলিং আমাদের একেবারে বিধ্বস্ত করে দিল। যুদ্ধে আমাদের পিছু হঠা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। মীর শওকত বাহিনীর কালুরঘাট পশ্চিমাঞ্চলের ফ্রন্ট লাইন প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে পিছু হঠে কর্ণফুলীর পূর্বতীরে চলে গেল। লেফটেন্যান্ট মাহফুজ তাঁর কোম্পানীকে সরিয়ে মদুনাঘাটের উত্তর পূর্বে নিয়ে গেলেন।
আমরা যারা অসামরিক যোদ্ধা, মূল সৈন্য বাহিনীর সাথে সাহায্য সহযোগিতার জন্য স্বেচ্ছায় সংযুক্ত হয়েছিলাম, তারা যে যেদিকে পারলাম প্রাণ নিয়ে পালালাম। আমি আমার কাছে রক্ষিত চারটি হ্যাণ্ড গ্রেনেড ও ৭.৬২ মিঃ মিঃ ২০০ রাউন্ড গুলি নিয়ে হামিদচরের ভিতর দিয়ে কর্ণফুলীর তীর বেয়ে গ্রামে পালিয়ে এলাম।'
সুধি পাঠক, উপরে উল্লেখিত আমার বিবৃতিটি ১৯৯৪ সালের আগস্ট মাসে দৈনিক পূর্বকোণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং ১৯৯৬ সালে তা বই আকারে বের হয়েছিল। কালুরঘাট যুদ্ধ নিয়ে মেজর জিয়া নিজের বাহাদুরী ফলাতে গিয়ে ওই যুদ্ধের মূল কমাণ্ডার মেজর মীর শওকতের নাম মুখে নেন নি। কিন্তু মেজর জিয়ার নিত্য সহচর ৮ম বেঙ্গলের কোয়ার্টার মাস্টার ক্যাপটেন অলি আহমদ খুব সামান্য করে হলেও কালুরঘাট যুদ্ধের মূল কমাণ্ডার মেজর মীর শওকতের কথা স্বীকার করে একটি বিবৃতি
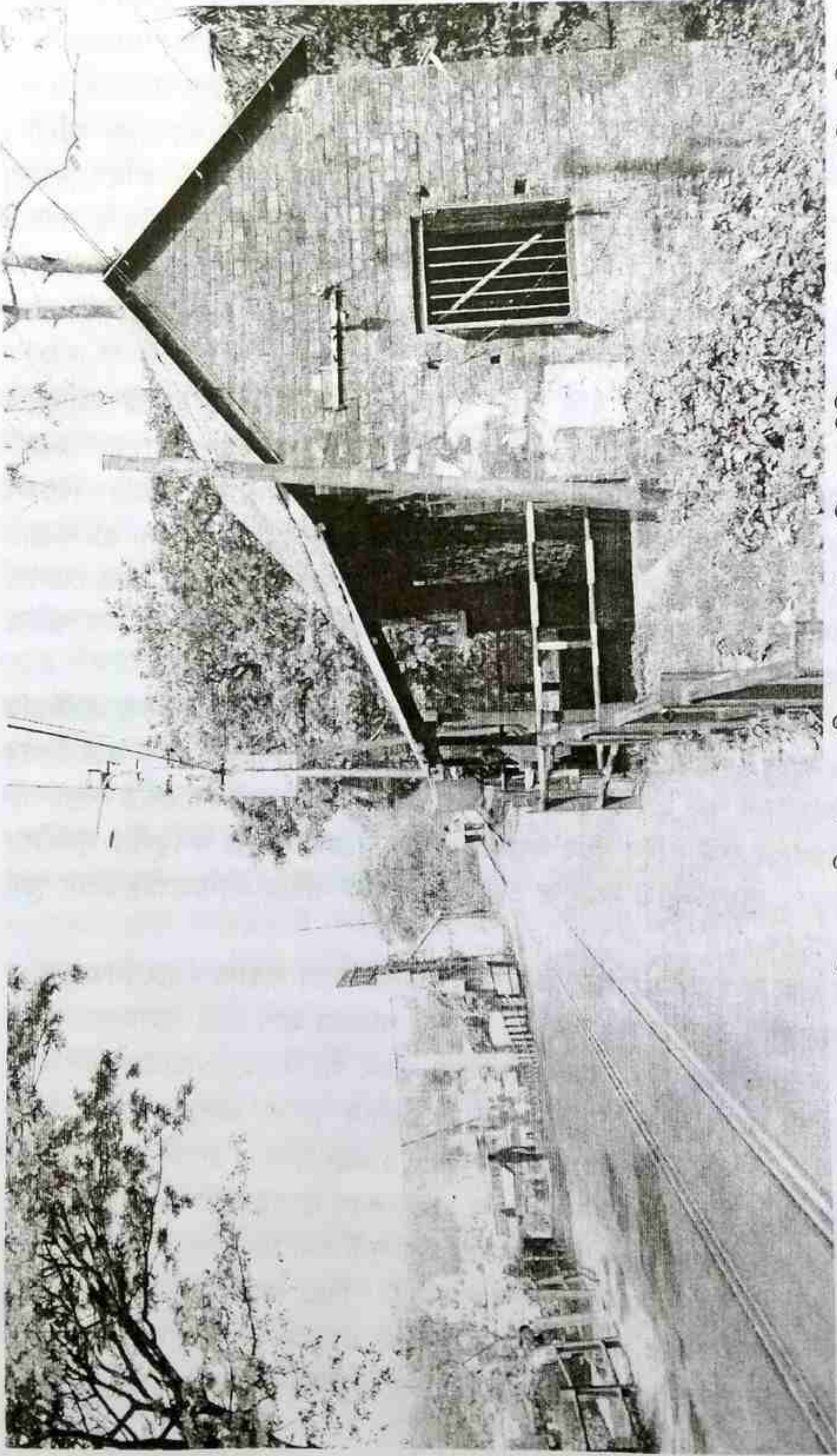
এটি সেই ঐতিহাসিক কালুরঘাটের পশ্চিম প্রান্তের ছবি। মেজর মীর শওকত আলীর নেতৃত্বে যেখানে পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে ভয়াবহতম যুদ্ধ হয়েছিল। ব্রীজের উপর যে লাল ঘরটি দেখা যাচ্ছে সেখানেই কোম্পানী কমান্ডার ক্যাপটেন হারুণ আহমদ চৌধুরী পাকিস্তানি গোলার আঘাতে আহত হয়েছিলেন।
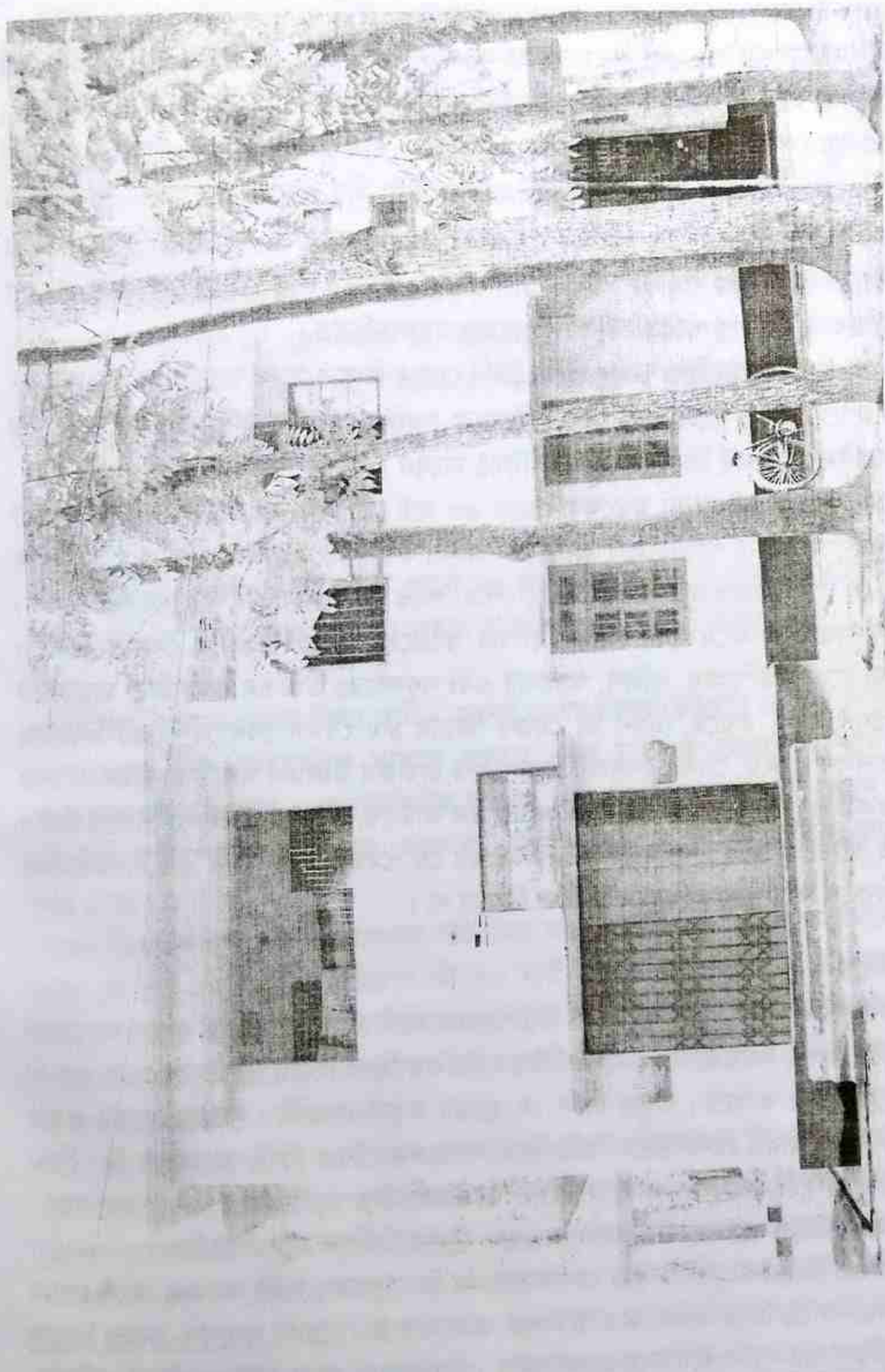
এটি সেই ঐতিহাসিক রামগড় পোস্ট অফিস : যার দোতলায় বসে ৩১ মার্চ থেকে ৪ঠা মে পর্যন্ত দীর্ঘ এক মাসের উপরে অলসভাবে সময় কাটিয়েছিলেন মেজর জিয়া। মে মাসের ২ তারিখ ক্যাপটেন অলি আহমদ এখানে এসেই মেজর জিয়ার সাথে দেখা করেছিলেন বলে দাবী করেছেন।

দিয়েছিলেন। বিবৃতিটি ক্যাপটেন অলির জীবনী গ্রন্থ 'জীবনের শেষ নেই' গ্রন্থের ১৪০ পৃষ্ঠায় ছাপানো রয়েছে। পাঠকের অবগতির জন্য সেটি এখানে উপস্থাপন করা হল।
স্বাধীনতাযুদ্ধের রক্তঝরা দিনগুলোতে বহু ঘটনা ঘটেছে। সব ঘটনা মনে নেই। তবে কিছুতো মনে থাকবেই। শহীদ জিয়াউর রহমান তখন রামগড়ে অবস্থান নিয়েছেন। রামগড় পোস্ট অফিসে তাঁর অফিস। ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামও সেখানে আস্তানা নিয়েছেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের আরেক অসম সাহসী বীর পুরুষ। এর মধ্যে কালুরঘাটে একটি সংঘর্ষে মেজর শওকতের নেতৃত্বে পাক-সেনাদের আক্রমণ নিষ্প্রভ করে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন করেন তাদের এবং তাদের পিছু হটিয়ে দেন তাঁর সাথের মুক্তিবাহিনী। এর পরে তাঁরা চলে আসেন মহালছড়িতে।
সমস্ত বিষয়টি অবহিত করার জন্যে তিনি মেজর জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন রামগড়ে। তাঁর ইচ্ছে ছিল মেজর জিয়াকে সবকিছু অবহিত করে তাঁর নির্দেশ নিয়ে পরদিন সকালেই তিনি খাগড়াছড়ি ফিরে যাবেন।
মেজর জিয়া চট্টগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে ৩০ মার্চ সেই যে রামগড়ের সরকারী পোর্স্ট অফিসে আস্তানা গড়েছিলেন, ক্যাপটেন অলির বর্ণনা থেকেই আমরা নিশ্চিত হলাম যে ২ মে মীর শওকত বাহিনী খাগড়াছড়ি পৌঁছা পর্যন্ত সেখানেই তিনি অবস্থান করছিলেন। ব্যাপারটি আমাদেরকে দারুণ বিস্মিত করেছে। সাড়া বাঙলায় যেখানে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার এবং সরকারের উর্ধ্বতন কর্মচারীরা মাঠেঘাটে প্রাণপণ যুদ্ধ করছে, এমন কী মেজর জিয়ার ৮ম বেঙ্গল যেখানে যুদ্ধের ময়দানে প্রাণপণ লড়ছে, সেখানে মেজর জিয়ার মত একজন উর্ধ্বতন সামরিক অফিসার প্রায় একমাস রামগড় পোস্ট অফিসে অলস দিন কাটাবে, এটা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। এ ঘটনা থেকেই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, মেজর জিয়া তার প্রিয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে কিছুতেই রাজি ছিলেন না।

এগার

ক্যাপন্টেন অলি আহম্মদ, মেজর মীর শওকত আলীর নেতৃত্বে ৯-১১ এপ্রিল কালুরঘাট যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। যদিও তাঁকে পাকিস্তানি বাহিনীর মুখোমুখি হতে হয় নি স্ট্রাটেজিক কারণে। তবুও তিনি সে যুদ্ধের মহান সেনানী। সুতরাং যুদ্ধের প্রকৃত বর্ণনাটি আরও বিশদভাবে তিনি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি এখানে যুদ্ধের যে বর্ণনাটি দিয়েছেন তা হুবহু তাঁর গুরু মেজর জিয়ার অনুকরণ। মেজর জিয়া বলেছেন- ২০ বালুচ ও ৫৩ ব্রিগেট নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।
মেজর জিয়া কালুরঘাট যুদ্ধ চোখে দেখেন নি। সুতরাং তিনি অন্যের থেকে শোনা কথা বলতে গিয়ে অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা বর্ণনা করতে পারেন। তদুপরি, মেজর জিয়ার মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে উল্লেখ করারমত গৌরবজনক এমন কোনও ভূমিকা নেই যে,

বুক ফুলিয়ে যা তিনি নিজের বলে দাবী করতে পারেন। তার উপর তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেনই মুক্তিযুদ্ধকে বিভ্রান্ত করার জন্য। পাকিস্তান তাকে সেভাবেই মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রবেশ করিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর দেশের পক্ষে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে ধরে নিতে হবে।

কিন্তু ক্যাপটেন অলির অন্তত কালুরঘাট যুদ্ধক্ষেত্র নিয়ে বুক ফুলিয়ে বলার মত ভূমিকা ছিল। অন্তত তিনি যুদ্ধের স্তরবিন্যাস, পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের সময় ও ক্ষমতার ব্যবহার, বাঙালি সৈন্যদের প্রতিআক্রমণ ও কার কী ভূমিকা তা বিশদ উল্লেখ করতে পারতেন। অথচ তিনি তা না করে তাঁর গুরুর ভাষায় এমন হালকা করে সেই ভয়াবহ যুদ্ধের বর্ণনা করলেন যে, দেখে মনে হয় কালুরঘাটের যুদ্ধ তিনি দেখেন নি। অন্যের থেকে শুনেই বলছেন। তাঁদের এই হীনমন্যতার জন্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবজনক ইতিহাস আজ ভূলুণ্ঠিত। এটি নিন্দনীয়।

বার

'স্বাধীন বাঙলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' থেকে ৩০ মার্চ মেজর জিয়া যে বেতার ঘোষণাটি দিয়েছিলেন সে ব্যাপারে গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায় ছাপানো তাঁর দাবীটি এরূপ-

৩০শে মার্চ সকালে মেজর জিয়া স্বাধীন বাঙলা বেতর কেন্দ্র (চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র) থেকে আর এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাঙলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কমাণ্ডার হিসেবে ঘোষণা করেন। এই দিন দু'টি পাকিস্তানি বিমান থেকে গোলাবর্ষণ করে বেতার কেন্দ্রটিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

মেজর জিয়া কর্তৃক বেতার ঘোষণায় আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে ঘোষণা ২৭ মার্চ দিয়েছিলেন কী ৩০ মার্চ দিয়েছিলেন, সেটা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে; কিন্তু তবুও এটা সত্যি যে, তিনি ২৭ ও ৩০ ওই দু'দিন দু'ধরনের ঘোষণা প্রচার করেছিলেন। সম্ভবতঃ এই একটি বিষয় মেজর জিয়া তাঁর পুরো সাক্ষাৎকারে সত্যি কথা বলেছেন।

তবে ওই দিন তাঁর ভাষণ প্রচারের আধা ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানি দু'টি স্যাবের জেট জঙ্গী বিমান বহাদ্দারহাটস্থ স্বাধীন বাঙলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের উপর মুহুর্মুহু মেশিনগানের গুলি বর্ষণে পুরো কেন্দ্রটি তছনছ করে দেয়া এবং সেখানে কেন্দ্র পাহারারত বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য হতাহতের ব্যাপারে তিনি কিছুই বলেন নি। তিনি একথাও বলেন নি যে, ওই হামলার এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি তাড়াহুড়া করে চট্টগ্রাম ছেড়ে রামগড়ে চলে গিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে সেটাই তাঁর শেষ যাওয়া।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ঃ দলিলপত্র গ্রন্থের ৪০ থেকে ৪৫ পৃষ্ঠায় ছাপানো মেজর জিয়ার সাক্ষাৎকারের সর্বশেষ প্যারা হল নিচের এই দাবীনামটা। ব্যতিক্রমী কিছু নাই। সেই আগের মত সবকিছু নিজের বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এই শেষ প্যারাতেও।

পাঠক লক্ষ্য করুন-

১১ই এপ্রিল কালুরঘাট এলাকা থেকে অবস্থান সরিয়ে নেয়ার পর যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায়। এ যুদ্ধ চলে রামগড়, রাঙ্গামাটি এলাকায়। যুদ্ধ চলে কক্সাবাজারের পথে, শুভপুরে। যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই দলে দলে জনসাধারণ বিশেষ করে ছাত্ররা এসে যোগ দিয়েছে বাহিনীতে। অস্ত্র ধরেছে, ট্রেনিং নিয়েছে, বীরত্বের সাথে লড়াই করেছে।

একজন সাধারণ পাঠক, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যিনি দেখেন নি। মেজর জিয়া এবং তাঁর মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যাঁর কোনও ধারণা নেই, আমার বিশ্বাস, তাঁরা প্রত্যেকেই মেজর জিয়ার উপরের দাবীটি পড়ে ধারণা করবেন যে, রামগড়, রাঙামাটি, কক্সবাজার ও শুভপুরে-সব জায়গায় মেজর জিয়া যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন।

এ লেখা যারা পাঠ করেছেন, প্রত্যেকেই ইতোমধ্যে জেনেছেন যে, ২৫ মার্চ রাতে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ঘুমন্ত বাঙালি সৈন্যদের উপর পাকিস্তানি ২০ বালুচ রেজিমেন্ট আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করছে; এ খবর পাবার পর, মেজর জিয়ার নেতৃত্বে ষোলশহর সিডিএ মার্কেটে অবস্থিত মিনি ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৮ম বেঙ্গল রাত দুপুরে পলায়ন করে।

প্রথমে মেজর জিয়ার দল কদুরখীল বড়ুয়াপাড়া, পরে হুলাইন পখর খাঁর দীঘির পাড় পটিয়া সদরে অবস্থান নেয়। তারপর থেকে মেজর জিয়া আর কখনও চট্টগ্রাম শহরে বা আশে পাশের কোনও যুদ্ধে অংশ নেন নি।

এরপর ৩০ মার্চ বহদ্দারহাট বেতার সম্প্রচার কেন্দ্রে (এই কেন্দ্রটিকে সরকারিভাবে কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। আসলে ওটির নাম হওয়া উচিত ছিল বহদ্দারহাট বা চান্দগাঁও বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র। কারণ কালুরঘাট ওখান থেকে অনেক দূরের স্থান) পাকিস্তান জঙ্গী বিমানের আক্রমণের তীব্রতা দেখে মেজর জিয়া অন্যদের ফেলে নিজের পৈত্রিক প্রাণ নিয়ে রামগড়ের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেছেন। সেই যে গেলেন, আর পেছনে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরৎ আসার কোনও তাগাদাই অনুভব করেন নি তিনি। এখন সেই মেজর জিয়াই আবার দাবী করেছেন ১১ এপ্রিল কালুরঘাট থেকে অবস্থান সরিয়ে নেবার পর যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে বিস্তির্ণ এলাকায়।

মেজর জিয়া খোলাশা করে বলেন নি কালুরঘাট থেকে কীসের অবস্থান বা কাদের অবস্থান তিনি সরিয়ে নিয়েছিলেন। এবং সরিয়ে কোথায় নিয়েছিলেন। তাঁর দাবী

অনুযায়ী যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে বিস্তির্ণ অঞ্চলে। আমরা বুঝতে পারছিনা সেই বিস্তির্ণ অঞ্চলটা কোথায়। কোন্ কোন্ জায়গায় তিনি যুদ্ধ করেছেন।

প্রথমে জানা দরবার, কালুরঘাট যুদ্ধে কি তিনি ছিলেন? রাঙামাটি, মহালছড়ি, বুড়িঘাটের সেই ভয়াবহতম যুদ্ধে কি তিনি ছিলেন? শুভপুর ব্রীজের সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধ, যে যুদ্ধে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফির নেতৃত্বে এক বিরাট শক্তিশালী পাকিস্তানি সৈন্যদলকে নাস্তানাবুদ করে দেয় আমাদের অগ্রবর্তী মুক্তিবাহিনী, সেই যুদ্ধে কি তিনি ছিলেন? চট্টগ্রাম শহর থেকে ২০ কিলোমিটার ক্যাপটেন সুবিদ আলী ভুঁইয়ার নেতৃত্বে কুমিরার সেই প্রচণ্ডতম সম্মুখযুদ্ধ-যে যুদ্ধে কোম্পানী কমাণ্ডার সহ পুরো এক কোম্পানী পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়, সে যুদ্ধে কি তিনি ছিলেন?

আমরা জানি এর কোনও যুদ্ধেই তিনি উপস্থিত ছিলেন না। তিনি যে ছিলেন না, এটা আমার মুখের কথা নয়। এসব তাঁর সতীর্থ সহযোদ্ধারাই বলে গেছেন। তাঁরা বলেছেন তাঁর জীবনকালেই। শুধু জীবনকালেই নয়, একই পুস্তকে, একই গ্রন্থে (বাঙলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র) তাঁর পাশাপাশিই তাঁরা তাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা না করে তিনি চুপ থেকেছেন। কিন্তু ইতিহাস চুপ থাকেনা। ইতিহাসকে চুপ রাখা যায় না। যায় না বলেই আজ ইতিহাস তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাস আজ প্রমাণ করেছে, মেজর জিয়া বাঙলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে বিন্দুমাত্রও অবদান রাখেন নি। মুক্তিযুদ্ধে তার কোনও গৌরবজনক ভূমিকা নেই। ছিল না।

তদুপরি আমি প্রথমেই দাবী করেছিলাম-**মেজর জিয়া ছিলেন আগাগোড়া একজন পাকিস্তানের অনুগত সৈনিক। পাকিস্তানেই তাঁকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রবেশ করিয়েছিলেন। আমৃত্যু তিনি পাকিস্তানের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করে গেছেন।** এ ব্যাপারে আমরা প্রমাণ হিসেবে ইতিমধ্যে বহু দলিল হাজির করেছি। তবে এখানে আরও কয়েকটি উপস্থাপন করব।

প্রথমেই আমি ক্যাপটেন রফিকুল ইসলামের সাথে লে. কর্ণেল এম.আর. চৌধুরীকে নিয়ে মেজর জিয়া যে ২৪ মার্চ রাত ৯টায় রেলওয়ে পাহাড়ে দেখা করতে গিয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে বলব।

পাঠক স্মরণ করুন, সেখানে মেজর জিয়া আর লে. কর্ণেল এম.আর চৌধুরীর আচরণ। ২৪ মার্চ রাত ৯টা পর্যন্ত তাঁরা দু'জনের কেউই পাকিস্তানিরা বাঙালিদের উপর আক্রমণ চালাবে তা বিশ্বাসই করেন নি। তাঁদেরকে ক্যাপটেন রফিক বারবার বলা সত্ত্বেও তাঁরা একগুঁয়েরমত বার বার বলছেন, **পাকিস্তানিরা কখনও বাঙালিদের উপর আক্রমণ চালাবেনা। এমন কী ক্যাপটেন রফিকের বিদ্রোহের সিদ্ধান্তকেও তাঁরা হঠকারী বলে অভিহিত করেছেন। এর থেকেই ধারণা জন্মে যে,** মেজর জিয়া ছিলেন পাকিস্তানের

প্রতি অবিচল বিশ্বাসী। কর্ণেল চৌধুরী অবিচল বিশ্বাসী ছিলেন না-বলেই পাকিস্তানিরা তাঁকে প্রথম সুযোগেই হত্যা করেছে।

কর্ণেল চৌধুরীর ব্যাপারটিকে আমরা বয়সের কারণ হিসেবে বিবেচনা করলেও মেজর জিয়ারটা বয়সের কারণে "বিদ্রোহ করতে ভয় পাওয়া" হিসেবে বিবেচনা করতে পারি না। আমাদের হিসেব মত মেজর জিয়া প্রথম থেকেই জানতেন যে, ২৫ মার্চ রাতে ইবিআরসি'র বাঙালি ব্যারাক লাইনে ২০ বালুচ রেজিমেন্ট ম্যাসাকার করলেও মেজর জিয়ার কিছুই হবে না। তিনি জানতেন, পাকিস্তানিরা তাঁকে কৌশলে অন্য জায়গায় সরিয়ে রাখবে সে সময়। ইতিহাস সাক্ষি, ঘটনা তাই ঘটেছিল।

তার উপর তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারটিও আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। যদি সত্যিকার অর্থে মেজর জিয়া বিশ্বাস করতেন যে, পাকিস্তানিরা সময় ও সুযোগ এলেই বাঙালির উপর হামলে পড়বে, তাহলে অবশ্যই তিনি চট্টগ্রামের নতুনপাড়া সেনানিবাসের অভ্যন্তরে অফিসার্স কোয়ার্টারে অবস্থিত তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী ও শিশু সন্তান তারেক রহমানকে সেনানিবাসের বাইরে কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে আসতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি।

এক্ষেত্রেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মেজর জিয়া জানতেন, যত যাই হোক, পুরো সেনানিবাস ধ্বংস হয়ে যাক, বেগম জিয়ার কিছুই হবে না। আসলে ঘটেছিলও তাই। ২৫ মার্চ রাত ১১.৩০টার সময় ২০ বালুচ রেজিমেন্ট ইবিআরসি'র আড়াই হাজার সৈন্যকে ঘুমন্ত অবস্থায় মেরে হতাহত করে পুরো বাঙালি ব্যারাক ধ্বংস করে দিয়ে যে মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করেছিল তার সামান্য আঁচড়ও বেগম জিয়াউর রহমানের গায়ে লাগেনি। তিনি নিরাপদে ২৬ মার্চ সকালে নতুনপাড়া সেনানিবাস থেকে রিক্সায় শিশুপুত্র তারেক রহমানকে নিয়ে নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটিতে আশ্রয় নেন। সেখানে যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর স্বামী দলবল নিয়ে ষোলশহর সিডিএ মার্কেট থেকে রাত দুপুরে অজ্ঞাত স্থানে চলে গিয়েছেন, তখন তিনি সেদিনই চট্টগ্রাম ত্যাগ করে ঢাকার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চকবাজার অলিখাঁ মসজিদের উত্তরে মেডিক্যাল স্টাফ কোয়ার্টারের সামনে বেগম জিয়াকে বহনকারী রিক্সাকে তল্লাশি চালানোর জন্য স্থানীয় যুবকরা আটকালে সেখানে এক অনভিপ্রেত ঘটনার জন্ম হয় এবং বেগম জিয়ার সেদিন আর ঢাকা যাওয়া সম্ভব হয় নি।

বেগম জিয়াকে এই দিনই চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা অ্যাডভোকেট বদিউল আলমের দুই কর্মচারী ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান এবং বদিউল আলমের জামালখানস্থ বাসায় আশ্রয় দেন।

পরদিন ২৭ মার্চ দুপুর পর্যন্ত মেজর জিয়া কোথায় আছে সে খবর জানতে নাপারার কারণে অথবা পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী সেদিনই বিকেলে বেগম জিয়া সদরঘাট স্টিমারঘাট

থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। তারপর দিন ২৮ মার্চ বেগম জিয়া ঢাকায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন এবং বাঙলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত ঢাকা সেনানিবাসে পাকিস্তানি সেনানায়ক জেনারেল জামশেদ খানের তত্ত্বাবধানে অবস্থান করেন।

তার উপর মেজর জিয়া যে আগাগোড়াই পাকিস্তানের অনুগত ছিলেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণে অনীহা।

পাঠক লক্ষ্য করুন, ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেজর জিয়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনও যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এমন দাবী তিনি কোথাও করতে পারেন নি। এমন কী তাঁর সতীর্থরাও দাবী করেন নি যে, তিনি কোনও যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন।

যেমন, ২৫ মার্চ রাতের ঘটনাই ধরুন। ওই দিন রাত সাড়ে এগারটায় চট্টগ্রাম নতুনপাড়া সেনানিবাসে ২০ বালুচ রেজিমেন্ট যখন বাঙালি ব্যারাক লাইনে হামলা শুরু করে তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা সৈনিকরা ৮ম বেঙ্গলের কাছে সাহায্যের প্রার্থনা করেও বিফল হয়। ক্যাপটেন রফিকুল ইসলামও চেষ্টা করেছেন ইপিআর ও অন্যান্যদের নিয়ে ৮ বেঙ্গল যেন নতুনপাড়া সেনানিবাসে আক্রান্ত বাঙালি সৈনিকদের সাহায্যে এগিয়ে যায়। কিন্তু মেজর জিয়া সকলের আবেদন অগ্রাহ্য করেছেন। বরঞ্চ ৮ম বেঙ্গলের কেউ কেউ আক্রান্ত সৈনিকদের উদ্ধারে এগিয়ে যেতে চাইলেও মেজর জিয়া টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে এমন এক ভীতিকর বক্তব্য প্রদান করে যে, সবাই ভয়ে আধমরা হয়ে গেল। সবাই একবাক্যে মেজর জিয়াকে অনুসরণ করে সোজা চট্টগ্রাম শহর থেকে বোয়ালখালীর কদুরখীল বড়ুয়াপাড়া প্রাইমারী স্কুলে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। ৮ম বেঙ্গলের কেউ বুঝতেই পারলেন না, কী কৌশলে তাঁদের হাত থেকে পাকিস্তানি সৈন্য ও সহায় সম্পদ রক্ষা করলেন তাঁদের কমান্ডিং অফিসার মেজর জিয়া।

এরপর কালুরঘাট যুদ্ধে কী হল? ৩০ মার্চ স্বাধীন বাঙলা বেতার কেন্দ্র যখন পাকিস্তানি স্যাবর জেট আক্রমণ করে আমাদের বাঙালি সৈন্য ও সম্পদ ধ্বংস করল তখন সেখান থেকেই মেজর জিয়া সোজা রামগড়ে পালালেন, পেছনে ফিরে তাকাবারও ফুরসত ফেলেন না। তিনি সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন কালুরঘাটে তাঁর প্রিয় পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে বাঙালি বাহিনী একটা তুমুল যুদ্ধ অত্যাসন্ন।

সেই আসন্ন ভয়াবহতম যুদ্ধকে এড়ানোর জন্যই মেজর জিয়া তাঁর সতীর্থদেরকে পেছনে ফেলে রামগড়ের মত নিরাপদ দূরত্বে চলে গিয়েছিলেন। এতে তাঁর চিন্তা ধারায় দু'টো উদ্দেশ্য লুকায়িত ছিল। এক- নিজের প্রিয় দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধরা থেকে বিরত থাকা। দুই- যদি পাকিস্তান জিতে যায় (তাঁর ধারণা ছিল বাঙলাদেশ কখনও স্বাধীন হবে না।) তাহলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে উপযুক্ত পুরস্কার গ্রহণ করা।

২৫ মার্চ রাতে শত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ৮ম বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্ণেল আবদুর রশিদ জানজুয়াকে হত্যা বা গ্রেপ্তার না করে তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেবার মধ্যেও মেজর জিয়ার ওই চিন্তাধারা কাজ করেছিল। তিনি পাকিস্তানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তিনি নিরঙ্কুশভাবে তাদের পক্ষেই রয়েছেন। পাকিস্তানিরা মেজর জিয়ার কার্যকলাপে খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। ফলে বাঙলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে যেসব পাকিস্তানপন্থী সেনাঅফিসার বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারকে হত্যার উদ্যোগ নেয়, পাকিস্তানের নির্দেশে তাঁরা প্রথমেই মেজর জিয়ার সাথে যোগাযোগ করে এবং হত্যার নীল নক্সা তাঁর কাছ থেকে অনুমোদন করে নেয়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকলকে হত্যার পর যা যা ঘটেছে, সবই রুটিনমাফিক ঘটেছে। সেই রুটিন ওয়ার্কের ধারাবাহিকতায় মেজর জিয়া ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসেন তর তর করে।

ক্ষমতার মগডালে উঠেই মেজর জিয়া কী করলেন? দ্রুত তিনি বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা হত্যাকারীদের সবাইকে পাকিস্তান ও পাকিস্তানের বন্ধুরাষ্ট্রে বাঙলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকুরী দিয়ে পুরস্কৃত করলেন এবং বাঙলাদেশে পাকিস্তানের যত দালাল এবং সমর্থক যারা আছে সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসালেন। বাঙলাদেশে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় দালাল কুষ্টিয়ার শাহ্ আজিজুর রহমানকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, সৌদি আরবে স্বেচ্ছানির্বাসিত পাকিস্তানি নাগরিক ও একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী কুখ্যাত খুনি গোলাম আযমকে জামাই আদরে বাঙলাদেশে এনে তাকে বাঙলাদেশের নাগরিকত্ব দিয়ে তার দলকে ক্ষমতার ভাগ দিয়ে বাঙলাদেশকে মিনি পাকিস্তান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন। পাকিস্তান যতদিক থেকে সম্ভব সবরকমের সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে পুনঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টাকে তরান্বিত করল এবং ধীরে ধীরে সফল হতে থাকল।

বাংলাদেশকে ঘটনাচক্রে হারালেও পরবর্তীতে ফের পাকিস্তান বানানোর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে পাকিস্তান তাদের অনুগত গোয়েন্দা সৈনিক মেজর জিয়াকে যে উদ্দেশ্যে বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন তা আজ শতভাগ সফল বলে মেজর জিয়া ও পাকিস্তান দাবী করতে পারেন।

আমরা আশা করছি, বাঙলাদেশের মানুষ পাকিস্তানের খপ্পর থেকে বাঙলাদেশকে আবার মুক্ত করার জন্য আর একটি নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি করবে, যে ইতিহাস মেজর জিয়ার মত কোনও খলনায়কের অনুপ্রবেশ ঘটবে না বা কোনও পাকিস্তানি দালালের কলঙ্কে সে ইতিহাস কলঙ্কিত হবে না। এটাই আশা করা যায়।
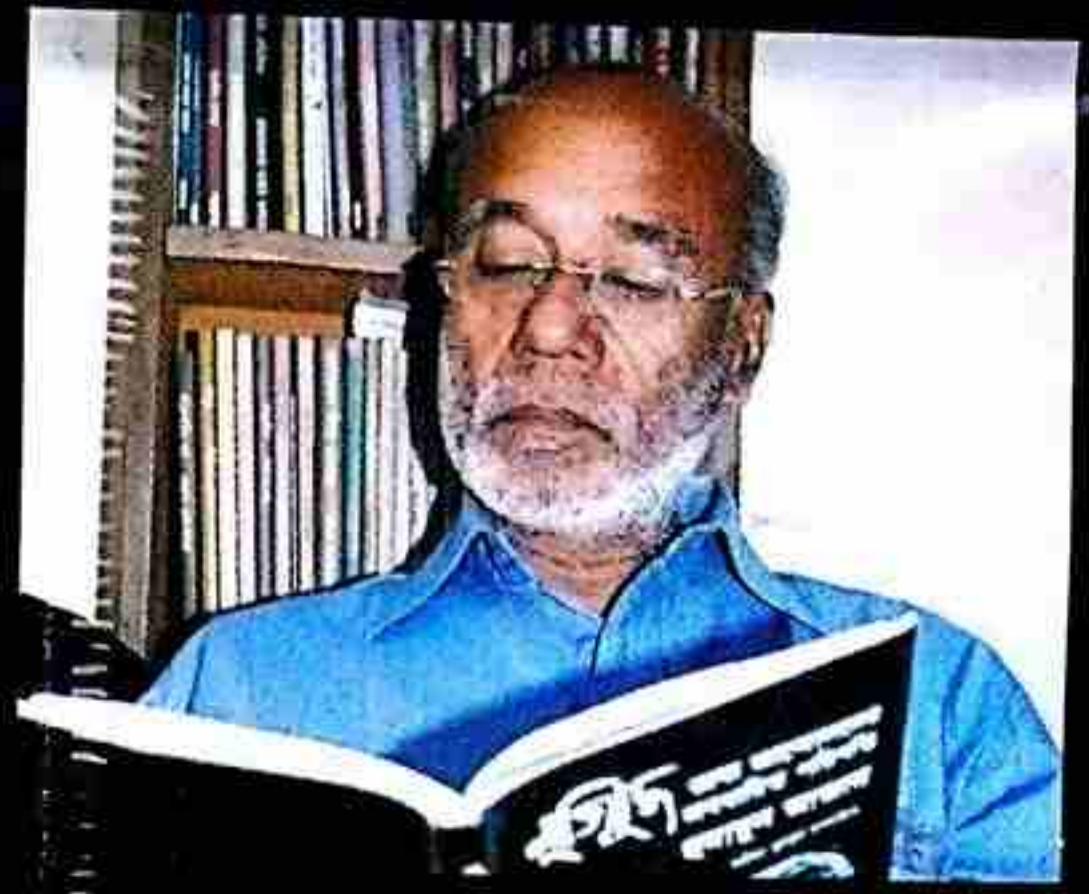
সিরু বাঙালি গণমুখী চেতনার মানুষ। তাঁর লেখক সত্তাও সেই সূত্রেই বিকশিত। পাকিস্তানিদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন প্রথম গ্রেফতার হয়েছিলেন ঢাকায়। কারাভোগ করেন ৬৯ দিন। জেল থেকে বেরিয়েই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নেমে যান সংগ্রামে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা কমান্ডার হিসেবে অসামান্য বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন সংগ্রামী এই মানুষটি।
লেখালেখি ১৯৬৮ সাল থেকে শুরু হলেও ১৯৭২ সালেই তাঁর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে। রাজনৈতিক চেতনাই তাঁর লেখার উপজীব্য বিষয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট নিয়ে তাই বড়দের জন্য লিখেছেন নানা রকম রচনা-ভাষ্য। চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী, দৈনিক পূর্বকোণ এবং ঢাকার দৈনিক সংবাদ-এ ছাপা হয়েছে তাঁর অনেকগুলো নিবন্ধ, যেসব লেখা নিয়ে ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে চারটি গ্রন্থ : 'বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার : ইতিহাসের নিষিদ্ধ সংলাপ', 'বাঙাল কেন যুদ্ধে গেল', 'সেনাপতির মুক্তিযুদ্ধ ছিনতাই'।
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ওই গ্রন্থগুলো দেশে-বিদেশে তুলেছে ব্যাপক আলোড়ন। তাঁর মনোযোগ এখন শিশুসাহিত্যের দিকে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কোমলমতি শিশুদের মাঝে ছড়িয়ে দেবার মানসে তিনি এখন নিরলসভাবে লিখে চলেছেন শিশুতোষ গল্প-উপন্যাস। এ পর্যায়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলো : 'স্বাধীনতার গল্প শোন, 'আব্বুর জন্য যুদ্ধ', 'মাগো আমরা লড়তে জানি', 'ছোটদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প', 'অথৈ পেয়েছে পতাকা', 'ছোটদের আরব্য রজনীর সেরা গল্প' ও 'মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ বীর'।

আলোকচিত্রী
রূপম ভট্টাচার্য